দ্বিতীয় অধ্যায়
তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা : শঙ্খ ঘোষের কবিতা

স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীকালে অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কয়েক বছরে বাংলা কবিতার আঙিনায় প্রথম আধুনিকতার চিহ্নযুক্ত কবিতা উঠে আসে— যে সমস্ত কবির হাত থেকে সেইসব কবিতা পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই প্রথম আধুনিক কবি। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে 'আধুনিকতার চিহ্নযুক্ত' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? অতএব, 'আধুনিকতার চিহ্নযুক্ত' কথাটিকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেবার জন্য 'আধুনিকতা' এবং 'আধুনিক কবিতা' সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

'আধুনিক' (Modern) বিশেষণটির আগমন 'অধুনা' শব্দ থেকে— যার আভিধানিক অর্থ হল 'আজকাল' বা 'সাম্প্রতিক'। ইংরেজীতে 'Modern' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লাতিন 'Modo' থেকে— যার অর্থ 'ঠিক এই মুহূর্ত' আর 'আধুনিকতা' (Modernity)— আধুনিকতার সূত্রপাত রেনেসাঁস পরবর্তীকালে অর্থাৎ মানবতা, যুক্তি, বুদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কার, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পের ফলে। অপর দিকে 'আধুনিক' আর 'সাম্প্রতিক'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান— 'আধুনিক' হল বর্তমানের সঙ্গে অতীত-ভবিষ্যতের মিলন অন্যদিকে 'সাম্প্রতিক' হল শুধুমাত্র ঘটমান বর্তমান অর্থাৎ ভীষণভাবে সাময়িক বা ক্ষণকালীন (Contemporaneity)। এহো স্বীকার্য এবং আগে 'আধুনিক কবিতা'—

> "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের আবার এই এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিক্ষবিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা ও নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"[১]

সময়ের দিক থেকে আধুনিক হলেই আধুনিক কবিতা হয় না— নতুন সুর, ঐতিহ্যকে সময়ের সঙ্গে সচেতনভাবে গ্রহণ, বর্তমান জীবনের ক্লান্তি-নৈরাশ্য এবং মন-মনন-দেহ-কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুকেই নিজের করে নেয় আধুনিক কবিতা অর্থাৎ 'মনের চিরপদার্থ' কলাময়ভাবে প্রকাশিত হয়।

> "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে

> পারে। এই হিসেবে মহাভারতের কোনো কোনো অংশ আধুনিক কাব্য— এবং সোফাক্লেস ও ঈসকাইলের কিছু-কিছু আগেকার যুগের আরো কোনো-কোনো কাব্যের নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে; পরে মধ্যযুগের (নানা দেশের) ও তারপরে কয়েক শতাব্দীর— বিশ শতকের দ্বিতীয় শতক অবধি— বিশেষ সব কবিতা এই হিসেবে আধুনিকতার দাবী জানালে আজকের কৃতী পাঠকের চেতনায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে বলে মনে হয় না।"[২]

অতএব, আলোচ্য যে, আধুনিক কবিতা সময়ের কবিতা হয়েও সময়াতীতের— তাতে চলে আসতে পারে পুরনো কবিদের কাব্যাংশ, শেকস্‌পীয়রের সনেট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, ডান সহ প্রমুখের কবিতা। এইসব ব্যাপকতর আলোচনা সংজ্ঞাগুলির পাশে আরেকটি আলোচনা মূল্যায়িত করা জরুরী—

> "আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রিয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[৩]

সমালোচকগণের মূল্যবান কথাগুলিকে সরলভাবে সাজালে যা দাঁড়ায়— কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে মুক্তির প্রয়াস; স্বর-সুরে নতুনত্ব; নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার নাগরালির অভিঘাতে ক্লান্তি-নৈরাশ্য-হতাশা এবং আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাবের প্রকাশ। ঐতিহ্য সচেতন; দেহকে সার্বিকভাবে স্বীকার; বাক্‌রীতি-কাব্যরীতি; শব্দ, চিত্রকল্প, উপমা, পুরাণ ব্যবহারে পরিমিত অথচ অর্থ-ঘনত্বের গভীর বৈচিত্র্যময় কবিতাই আধুনিক কবিতা। এই আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে বিমূর্ত (Abstraction) ভাবনার গুণ এবং অর্থহীনতার (Absurdity) অত্যন্ত সচেতন প্রয়াস; ভাষার সচেতন প্রয়োগ ও আঙ্গিকের প্রথাগত ব্যবহারকে চূর্ণ করে সূক্ষ্ম-জটিল বৈচিত্র ও আত্মবীক্ষণ আঙ্গিকগত কৌশলের প্রকাশ। তবে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, আধুনিক কবিতার সঙ্গে কালগত সম্পর্ক থাকলেও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই মূল। কারণ আধুনিক কবিতা সমকালীন হয়েও সমকালীন নয় অর্থাৎ এইসব কবিতার মধ্যে চিরকালীনতার স্বর-সুর বিরাজমান। যদিও কবির চিন্তাশিল্পের বিশেষ প্রক্রিয়ায় বস্তুশিল্প প্রায় শূন্যতায় এসে পৌঁছেছে; অস্তিত্বের বিচূর্ণীকরণ, সময়ের বিচূর্ণীকরণ; অখণ্ড অস্তিত্ব-সময়ের এক অপূর্ব অসংলগ্ন-অর্থহীনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির চরম সীমা— 'শুদ্ধ আত্মগত' স্পর্শ করেও নৈর্ব্যক্তিক। শঙ্খ ঘোষের কাছে এই আধুনিকতার অর্থ— মানবিকতা।

> "যে মানুষে বেঁচে আছে তার অসংখ্য অপূর্ণতা নিয়ে, মৃত্যু আর প্রকৃতি দিয়ে পদে পদে খণ্ডিত যে মানুষ, তারই মধ্য দিয়ে নিজের বিকাশ খুঁজে চলেছে কেবল, তার

> সেই চলনতটাকেই বলে মানবিকতা। এ মানবিকতার মধ্যে আছে একটা সর্বগ্রাস। ইতিহাসের সময়ের মধ্যে এ মানুষের একটা পরিচায় আছে, দার্শনিক মহাসময়ের মধ্যে আছে আরেক পরিচয়। এলিয়টের কবিতায় ছিল The river is whithin us, the see is all about us! এ দুইকে ভিন্ন করে নয়— একত্র করে আমাদের যে জীবন। দৈনন্দিন মুহূর্ত থেকে তাকে লক্ষ্য করতে পারাকেই বলি মানবিকতা। সেই মানবিকতার চর্চার মধ্যেই আছে যোগ্য আধুনিকতা।"[৪]

তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় এই আধুনিকতা আসার আগে বোদলেয়ারের 'Les Fleurs du Mal' (১৮৫৭), ফরাসী চিত্রকলায় ইমপ্রেসনিজমের সূচনা (১৮৬২), কার্লমার্কস এর 'Das Capital' (১৮৬৭), র‍্যাবোর 'Une Saison En Enter'-এর সমাপ্তি (১৮৭৩), মালার্মের 'La Derniere Moder' প্রকাশ (১৮৭৫), পল ভের্লেনের 'Les Poets Maudits' (১৮৮৪), কিউবিজমের জন্ম (১৮৮৫-৮৭), র‍্যাবোর 'Verse Libre' (১৮৮৬), মালার্মের 'Poésis' (১৮৮৭), হেনরি বের্গসঁ-এর 'Essai Sur les donnés immédiates de la Conscience' এবং ভালেরির প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ, অর্থার সিমন্স 'The Symbolist movement in literature' (১৮৯০), রুশ কাব্যে প্রতীকিকতার আরম্ভ (১৮৯৪), ইয়েটস্-এর 'Poems' (১৮৯৫), ফ্রয়েডের 'The Contributions to the theory of Sex' এবং আইনস্টাইন কর্তৃক আপেক্ষিকতার প্রথম বিবৃতি প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা (১৯১৪), ভালেরির 'Album des vers anliens' (১৯২০), গারথিয়া লোকরা 'Libro de poems' (১৯২১), 'Revolutions Surrlalists' (১৯২৪) পত্রিকা প্রকাশ। সবকিছুর মন্থনের ফল এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহের ফলাফলের কথা স্বীকার্য। এই আধুনিকতা ভেতরে ভেতরে ঊনিশ শতকের রোম্যান্টিকতার ধারা বহন করলেও সুপ্রচুর নতুন লক্ষণ আবিষ্কার করে। বিশেষ করে স্মরণীয় যে, ঊনিশ শতকের শেষে দেখা যায় রোম্যান্টিকতার অবক্ষয়— ব্যক্তিগত, তাৎপর্যহীন প্রথামাফিক ফেনিল আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রকাশ মাত্র। এই অবস্থা থেকেই জোর পেল নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততার— বিষয়ীর আত্মতা (Subjectivity) বিষয়ের আত্মতায় (Objectivity) অথচ কেন্দ্রে থেকে গেছে 'উত্তমপুরুষ'। কালজ্ঞান, ইতিহাসচেতনা প্রকাশের পরিমিত মননের বৈচিত্র, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শে ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, যুক্তি পরম্পরাগত বিন্যাস-ভারসাম্য সহযোগে খোঁজ আত্মিক সমগ্রকে— যাতে সৌন্দর্য ও অসুস্থতা, সুন্দর ও কুৎসিত, আনন্দ ও ব্যাধি-অসংগতির বোধ সমানভাবে উচ্চারিত। এই কবিতা হৃদয়ের কল্পনা—কল্পনার সঙ্গে চিন্তা-অভিজ্ঞতা-জীবনযাপন পদ্ধতির এক অমোঘ-অতিসংপ্রেষণের বহুস্তরীভূত উচ্চারণ যা সময়-সমাজ-ঐতিহ্যকে ধারণ করে নিজ শরীরে।

> " and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence; the historical sense compels a man to

> write not merely with his own generation in his bones, ... This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is the same time what makes a writer most acutely conscious of his place in time, of his own contemporaneity"[৫]

আধুনিক কবিতার জয় আত্মসচেতনাতে— ধনতান্ত্রিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় নিজের মুখোমুখি বসাতে অর্থাৎ বিস্ময়-বিশ্বাসে; জীবনের মহত্ব-ক্ষণিকত্ব সম্বন্ধে সচেতনতায়; হ্যাঁ-না-এর বিপুল দ্বন্দ্বে; সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক চিত্র অঙ্কণে এবং ঐতিহ্যকে কালের প্রেক্ষিতে পুনর্মূল্যায়নে। এইসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক-রাষ্ট্রীক পরিবর্তনসমূহ। যথা— গ্রাম ভেঙ্গে শহর গড়ে ওঠা— মানুষসকল শিখে নেয় শহরের চতুরতা। ভাঙন দেখা যায় অন্দরে-বাইরে— যৌথ পরিবার এবং মনোবৃত্তির শিকড় ছিন্ন হতে থাকে এবং ব্যক্তিমুখিনতারপথ প্রসারিত হয়। এই প্রসারকালে গোকুলচন্দ্র নাগ এবং দীনেশরঞ্জন দাস-এর যুগ্ম সম্পাদনায় 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার প্রকাশ; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাবনায় 'কালিকলম' (১৯২৩); বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রগতি' (১৯২৭); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' (১৯৩১); বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং পরস্পর বিপরীতমুখী ঝড়ের মতো আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ; ব্যক্তিক উদ্যম-অবসাদ; ভালোবাসা-ভালোবাসাহীনতা যৌন সম্পর্ক, আত্মপ্রত্যয়-আত্মমুখিনতা-আত্মঅনাস্থার ক্ষত-বিক্ষত কবিতা উঠে আসে এবং দৃঢ়-প্রসারিত হয় আধুনিক কবিতার সূচনা— যাত্রা।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়র রচিত "ফ্ল্যর দু মাল" (Les Fleurs du Mal) বা "ক্লেদজ কুসুম" (১৮৫৭) কাব্যটিকে আধুনিক কবিতার উৎস ধরা হয়। কবিতার ক্ষেত্রে এই আধুনিকতার বিস্তার এলিয়ট, ইয়েটস, রিলকে, সাঁ জন পার্স, ভালেরি, পাস্তেরনাক, আপলিনেয়ার, হিমেনেথ প্রমুখের সময়কালে। সমভাবে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি আধুনিক বাংলা কবিতাশিল্পের পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতাতেও এই আধুনিকতা বর্তমান। তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত প্রমুখের কবিতার স্বাতন্ত্র্য প্রেমচিত্রের মতো কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর প্রেমচ্ছবি অঙ্কিত।

> "প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি;... একটিকে ভালোবাসিলেই আর একটিকে ভালোবাসিতে

শিখিবে; অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।... কারণ পথ চলিতে আর-কিছুই আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়।"[৬]

—'প্রেম' সম্পর্কে এমনই উদার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার কবি জয় গোস্বামী জানান—

"এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও যার মনে কখনো প্রেমের সঞ্চার হয়নি। স্পষ্টভাবে একটিও প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি আজীবন, এমন দুর্ভাগা নারীপুরুষও নিশ্চয় আছে পৃথিবীতে— কিন্তু অন্তত গোপনে, নিরুচ্চাভাবেও, প্রেমের অনুভব জন্মায়নি কখনো-এইরকম পুরুষ বা নারী হৃদয় নেই।"[৭]

— এই প্রেম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ও আভিধানিক অর্থ হল— প্রিয় + ইমন্ (ভা.) = প্রেমন (১ম. ১বচন) = প্রেম। অর্থ— 'প্রিয়ভাব, সৌহার্দ, স্নেহ, ভালোবাসা'। এই প্রেম হল চিরজীবি। প্রেম যখন কারো জীবনে আসে সে জীবন নিজেই আলো হয়ে ওঠে। আর প্রকৃত প্রেমের সার্থকতা সম্মুখপানে চলাতে— গতিশীলতায়। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়— তাই কখনো কখনো কারো কারো জীবন দগ্ধ হয়। প্রেমের কারণেই-পুড়ে হয় ছাই। সে জীবন বাঁচে না। প্রেমের মূলে কাম বিরাজিত থাকলেও কাম প্রেম নয়— অর্থাৎ দেহগত ও দেহনির্ভর হলেও দেহকে অতিক্রম করেই এর যাত্রা। এই প্রেম 'ঋগ্বেদ সংহিতা', 'সংস্কৃত সাহিত্য', 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'বৈষ্ণব পদাবলী'— কোথায় নেই? সেকাল থেকে একাল— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ববর্তী-পরবর্তীকাল ধরে এই সময়ের সাহিত্যেও-এর উপস্থিতি সমানভাব লক্ষণীয় এবং শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমের ক্ষেত্রে এক আত্মনিবেদিত প্রাণ। তাঁর প্রেমে যেমন আছে আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা তেমনি আছে বিশ্বানুভূতির সঙ্গে ক্ষণিকের কিছু ছবি এবং মনে মনে সাঁতার দেবার কল্পনা। তাঁর প্রেম চেতনা সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ এবং জীবন প্রত্যয়ে ঋদ্ধ। কিন্তু আমরা এরই মধ্যে পেয়েছি ডারউইনের 'The Origin of the Species'। ১৯৮৭ সালে কার্লমার্ক্সের 'Das Capital' (প্রথম খণ্ড), ১৯০০ সালে ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams' ও ১৯০৫ সালে 'The three Contribution to the Theory of Sex' এবং আইনস্টাইনের 'Theory of Relativity' বা আপেক্ষিকবাদ এবং সর্বোপরি পরপর দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৭১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪২)। এত দিনের চেনা পরিচিতি বিশ্বাসের মূলে বড় রকমের আঘাত এবং সমস্ত ছক ভেঙে যাওয়া। চেনা-চেনা মূল্যবোধগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই টুকরো গুলিকে নিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে সুপ্রচুর কবিতা নানাভাবে লেখাও হয় এবং প্রেমেরও। জীবনানন্দ দাশ ক্লান্ত— বিস্ময়ে ও বিপন্নতায়। তবুও আশ্রয় খোঁজেন ক্ষণিকের শান্তির জন্য— দু'দণ্ডের শান্তির জন্য। বুদ্ধদেব বসু খুঁজলেন শরীর— আর সেই শরীর এল জৈবতা নিয়ে— কামনা নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের তো বলাই হল না— দ্বিধায়, নৈরাশ্যে আর যদিবা দেখা হল

তা— ‘অশ্লেষার রাক্ষসীবেলায়’! বিষ্ণু দে ব্যক্তিপ্রেম ও সামাজিকপ্রেমকে এক করে দিলেন। তাঁর প্রেমচেতনা ভীষণভাবে যুক্তিবাদী— সেই যুক্তির আড়ালে চাপা পড়ল প্রেম। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেম এল মিলন হতে হতেও না হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে— প্রশ্নবোধকে। সমর সেন কাম থেকে প্রেমকে আলাদা করে পৌঁছতে চেয়েছেন সত্যে— সৌন্দর্যে কিন্তু ‘বণিক সভ্যতার মরুভূমি’— সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায় প্রেম এল সমাজ ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মূল সুর— প্রেম। তিনি মূলত প্রেমের কবি। তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের মূল ধ্বনি প্রেম, তবে অতীন্দ্রিয় বা অমূর্ত নয়; মূর্ত— শরীরী রূপে।

> ‘‘প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি’ রচেছো আমায়—
> নির্ম্মম—নির্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।’’[৮]

আবার—

> ‘‘সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
> হেরি’ মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।
> সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে।
> দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
> —যৌবন আমার অভিশাপ।’’[৯]

একদিকে অস্বীকার করতে না পারার যন্ত্রণা, অন্যদিকে মনে হয়েছে— ‘অভিশাপ’! অনিবার্যভাবে প্রকট হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব—

> ‘‘বিধাতা, জানো না তুমি কী আপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে।
> না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
> গোপনে অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
> শুষ্ক হয়ে আছে তবু।’’[১০]

প্রেমের ক্ষেত্রে তৈরি করেছেন অমিতা, অপর্ণা, মৈত্রেয়ী, রমা, কঙ্কাবতী নামের বাস্তব জগতের নায়িকা। কবিতায় ফুটে উঠেছে তাদের চুল, ঠোঁট, আলজিভ— ইন্দ্রিয়-বাচক লৌকিক শব্দ। কিন্তু প্রেম থেকে গেল ‘ক্ষণ-প্রেম হয়েই— ‘আমার দুর্ভাগ্য এই সকল জেনেছি’!

প্রেমের নব-ভাষ্য অঙ্কনে জীবনানন্দ দাশ অন্যতম একটি নাম— ‘বনলতা সেন’ কবিতার নায়িকা যেন হাজার বছরের ক্লান্ত নায়কের আশ্রয়, শান্তিস্থল—

> ‘‘হাজার বছর ধ’রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।”[১১]

আবার অন্যদিকে অনুভব করেছেন—

“সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে;
...
কী কথা তাহার সাথে?— তার সাথে!”[১২]

—ঈর্ষা! প্রেম আর ঈর্ষা সমানভাবে এল। এই প্রেম-ঈর্ষা থেকে কবি পৌঁছে যান—

“সুজাতাকে ভালবাসতাম আমি—
এখনো কি ভালোবাসি?”[১৩]

—ভালোবাসা ছিল, এখনো কি আছে? এই বাস্তব প্রশ্ন— স্বাভাবিক ভাবেই! একজন সমালোচক—

“রোম্যান্টিক কাব্যে প্রেমের বর্ণনায় যে-মোহাবেশ, যে উচ্ছ্বাস থাকে জীবনানন্দের কাব্যে তা অনুপস্থিত। যে-প্রেম তিনি পাননি, যে-প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি।”[১৪]

অথচ প্রিয়ার দেহের রূপকে অঙ্কন করার জন্য জীবনানন্দ দাশের উপমা ব্যবহার অতুলনীয়— ‘বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ মনে আসে!’ অথবা ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা যেন!’ আবার ‘স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো দুধে আদ্র...!’ এই কবিই জানেন প্রেম ক্ষণিকের খেলা আর তাতে কেবল দৈহিক বিচ্ছেদই নয়, লেগে আছে মানসিক বিচ্ছেদও।

“তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
সাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে— দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
...
জল ভাসে আর সময় ভাসে— বটের পাতাখানি
আর সে নারী কোথায় গেছে ভেসে।”[১৫]

—ইতিহাস-মৃত্যু-প্রকৃতিচেতনা যুক্ত থাকলেও সেই প্রেমের স্মৃতি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে এসেছে এবং চেতনালোক থেকে পৌঁছে গেছে অবচেতন লোকে!

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'এখনো বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে থাকে'— অথচ ভীষণভাবে আস্থাহীন! কবি জানেন চিরপ্রেম যথাযথ নয়, স্মৃতিও অবিনশ্বর নয়— 'অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ'! দ্বন্দ্ব-সংকট—

> "মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
> স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার;
> বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
> আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিস্ফল সন্ধানে।"[১৬]

আবার—

> "সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
> আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।।"[১৭]

অন্যদিকে বিষ্ণু দে বিশ্বাস করেন প্রেমেই মুক্তি কিন্তু সে প্রেম অধরা! তাই প্রায়-নিরাশ্রয় হয়ে উচ্চারণ করেন— 'আসল কথাটা আমি যা বুঝি/ প্রেম ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি!' একজন সমালোচক বলেন—

> "শুধু যে ঐতিহ্যচেতনার মধ্যেই কবি প্রেমের রূপ খণ্ডিত দেখলেন তা নয়, বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ী পরিবেশও যে প্রেমের অনুকূল নয় সে-কথা কবি বহু স্থানেই বলেছেন। যেমন :
> সে-কালের প্রেমগাথা রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিত্তঝঞ্ঝরাশি।
> ফ্রান্‌চেসকার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।
> কারণ :
> সেকালের চিত্তঝঞ্ঝা সেকালে স্থূল পেশী স্নায়ুরই পোষাত। আমরা
> জেনেছি শাঁস অন্তঃসার। ও অসার ভয়াবহ আলোড়ন ছিবড়ে খোসা তো।
> ("কথকতা", 'চোরাবালি')
> '...এদিকে শরীর মন হোল বরণীয়, বসন্ত আসে পাত্রী যে কেউ হোক।' ব্যর্থ যৌবনের পঙ্গু উপভোগতৃষ্ণা চরণ-দুটিতে করুণ ও হাস্যকর রূপে ফুটে উঠেছে। শ্রীযুক্ত বিমল সিংহের ভাষায় বলা চলে— '...অল্প সময়ে অনেক উপভোগের ব্যর্থ চেষ্টা এবং ক্রমিক অবক্ষয়ের মধ্যে যৌবনস্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পঙ্গু যৌবনের ব্যস্ততা ছন্দে ধরা পড়্‌লো।"[১৮]

—এই প্রেমচেতনার সঙ্গে কোথাও-কোথাও প্রিয়া হয়ে উঠেছেন সাম্যবাদীচেতনাযুক্ত নায়িকা— কমরেড। মূলত, বিষ্ণু দে-এর প্রেমের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধির শানিত উজ্জ্বল্যের সঙ্গে আবেগ ও বেদনা এবং সাম্যবাদচেতনা।

অমিয় চক্রবর্তী প্রেমের ক্ষেত্রে এক বিরহী কবি— 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।' প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, তবে তাঁর উচ্চারণে বেদনার শান্তি আর ঐশ্বর্য বর্তমান। তাঁর মতে 'সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা সে ভাষা প্রেমের'। এই সময়ের প্রেম নিয়ে একজন সমালোচক—

> "অবশ্য শুধুই যে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বিরহান্তক তা নয়, যুগের অভিশাপেও এ-যুগের প্রেমের কবিতা বিরহান্তক। কবি নিজেই বলেছেন— "এবার মিলন শুধু বিরহ-উৎসবে"। এমন পরিবেশে মানুষ ঘর বাঁধতে পারে না; স্রোতের শ্যাওলা কি ক'রে পাবে অশ্বত্থ বটের স্থিতি! একমাত্র বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র মধ্যেই মেলে সার্থক মিলনান্তক প্রেমের রূপ। বুদ্ধদেব বসু পূর্বরাগ ও সম্ভোগের পরবর্তী অধ্যায় লেখেননি এবং বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতার পটভূমিকা সাম্যবাদী সমাজ। তাঁর প্রিয়া কমরেড। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী সকলেই বিরহের কবি। জীবনানন্দর প্রিয়া মৃতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রিয়া ক্ষণিকা, অমিয় চক্রবর্তীর প্রিয়া দূরগামিনী। তাঁর নায়িকা ট্রেনে, মোটরে, জাহাজে অবিরতই তাঁকে ছেঁড়ে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে! যুগকুবেরের অভিশাপ এই তিনজন কবিকেই চিরবিরহী ক'রে রেখেছে।"[১৯]

সমর সেন— কাম থেকে প্রেমকে আলাদা করে এক ভিন্নতর প্রেমের জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন কিন্তু 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি' সেই ভিন্নতর স্থানে পৌঁছতে দেয়নি। তাই তাঁর কাছে প্রেম 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস, স্যাকারিনের মতো মিষ্টি'! তাঁর প্রেম দেহময় আর তা ক্ষণিকের থেকেই ক্ষণতর। ধনতান্ত্রিক সভ্যত্যার মধ্যবিত্ত রক্ত যে মত্ত থাকতে চায় বিষাক্ত বাসনায়— সেই বাসনার কথা শ্লেষের সঙ্গে লেখেন সমর সেন। 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তা-ছাড়া একসঙ্গে শোবার দুর্লভ সুযোগ!' তাঁর প্রেমের কবিতাসমূহ প্রায়ই বিরহের, কষ্টের, অপ্রাপ্তির এবং দারুণভাবে ক্ষতময়। অন্যদিকে শান্ত-স্নিগ্ধ-নিঃসঙ্গ-একক-আত্মসমগ্র হৃদয়াবেগের অনন্য স্পন্দন শোনা যায় কবি অজিত দত্তের কবিতায়। প্রেম-বিরহ-মিলন-বিচ্ছেদ-আনন্দ-বিষাদ-পাওয়া ও না-পাওয়া এবং হারানো— এইসব পরস্পর বিপরীতমুখি ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ।

> "মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্যাম,
> মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
> ...
> আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মতো
> আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত;
> সে-আকাশ তোমার অন্তর

মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।।”[২০]

—পাওয়া নেই, না-পাওয়ার দ্বন্দ্বের পরেও, পরিসমাপ্তিতে আবার না-পাওয়া অথচ উচ্চারণে লেগে আছে পরম মমতা ও প্রাপ্তি। অরুণ মিত্র— মানুষ এবং মানুষের জীবনকে জড়িয়ে তাঁর ভালোবাসা, তাঁর কবিতার শিকড় জীবনের সমগ্রে। মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি প্রেম-চিত্র অঙ্কনে স্বতন্ত্র এবং সফল।

> “don’t you think that love is a dead thing? a thing of the past. উত্তরে একটা জোরালো রকমের ‘না’ শুনে অট্টহাস্যে পিঠ চাপড়ে বলেছিল: Oh you incorrigible romantic!”[২১]

—প্রশ্নকর্তার হঠাৎ করা প্রশ্নের উত্তর ছিল জোরালো রকমের ‘না’। শান্তিহীন সকাল আর ‘বিপন্ন বিস্ময়’-এ ক্লান্ত রাতের মুখ-মুখোশের ভারসাম্যহীন অসময়ে ভালোবাসা আদৌ আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে জানান—

> “না যায়নি। যায়নি যে, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই তো তোমাকে ভালোবাসতে হবে আরো, যুক্ত হতে হবে সমস্ত বিচ্ছেদ ভেঙে। বিচ্ছেদ কি নেই? পদে পদেই আছে, মুহূর্তে মুহূর্তে। বিশ্বাসঘাতকতা কি নেই? নিশ্চয়ই আছে, খুবই। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সচেতন লড়াইটাও আছে। সেই লড়াইতে ভালোবাসার চেয়ে বড়ো আধুনিকতা আর কি হতে পারে মানুষের?”[২২]

আর কবিতার ক্ষেত্রে—

> “তাই কোনো বন্ধু যখন বলেন যে প্রেমরে কবিতা আমি লিখিইনি কখনো, সে প্রস্তাবে আমরা একটা সায়ই থাকে। অথচ প্রেম ছাড়াই বা লিখেছি আর কটা?”[২৩]

—এমন সরল স্বীকারোক্তি, প্রেমে অপার-অগাধ বিশ্বাস-সচেতনতা, বাস্তবতা যাঁর কবিতায় পাওয়া যায় তিনি হলেন শঙ্খ ঘোষ।

> “এসো ভালোবাসো, এসো, সন্দেহ কোরো না, ভালোবাসো
> মাটি ছুঁয়ে কথা বলো, হাতে হাত রাখো, চুপ করো
> পলির প্রসাদে নাও মুছে নাও পাড়ের পাথর
> দেখো তার কাছে এসে নুয়ে আছে আহত মানুষ।”[২৪]

ব্যক্তিগত আবেগ নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটে যে মানুষ ‘আহত’, বিধ্বস্ত সেই মানুষের কথা ভালোবেসে লিখলেন। ভাঙা-ভাঙা মূল্যবোধগুলিকে আবার নতুন করে জোড়া লাগাতে বসেন— বসেন ভালোবাসতে। আর এই নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তি অতিক্রমী ভালোবাসার কথা প্রথম কাব্যগ্রন্থ “দিনগুলি রাতগুলি” (১৯৫৬) থেকেই প্রকাশ পেয়েছে—

"আমার দুঃখের রাত্রে পৃথিবীকে কৃপণের মতো
ভালোবাসি, সে আমার জয় নয়, ভীরুর আশ্রয়!
...
আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো তুমি!"[২৫]

এবং "প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে" (২০১২) কাব্যগ্রন্থে—

"এই পরাভব, এই গ্লানি
সে তো আমারই কৃত্যের ফল জানি
তবু তারই মাঝখানে তোমার শপথকথা ভাবি
তোমার সে-উচ্ছলতা তোমরা দ্যুতির কথা ভাবি।
...
সেই ট্রাজেডির থেকে কুমার তোমার শেষ স্বর
জলীয় আভাসে আজ ভাসে :
'তবুও দেখবেন—
নিশ্চিত জানবেন মনে মনে—
যদি কেউ পারে তবে সমস্ত বিরোধ ভেঙে আমরাই তা পারব একদিন।"[২৬]

—এখানেই শঙ্খ ঘোষের অনন্যতা এবং বেঁচে থাকা। ভালোবাসার পথে ব্যাপ্ত এক না-আমির সঙ্গে অবিরাম যোগের পথ। চেতনে-অবচেতনে, অধিচেতনে-প্রকৃতিতে-ভালোবাসায়, ইতিহাসে-দর্শনে, ব্যক্তিতে-সমাজে মিলিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ এই বাঁচা।

"ভালোবাসা সকলের চেয়ে বড়,...

কেন ভালোবাসা সকলের চেয়ে বড়ো? সেটা এই জন্যে এই অর্থে যে, এই বিন্দুগুলির চূড়ান্তহীনতার পক্ষে সে এক আন্তরিক নির্ভর, সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। অগাধ শূন্যতায় বেষ্টনের মধ্যে আমরা আছি, কিন্তু এই 'আছি' কথাটাকে ত্রিমাত্রিক করে তুলবার জন্য না-আমির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের যে যোগ চায় 'আমি', তারই নাম ভালোবাসা। আমি, না-আমি আর এর সম্পর্ক, এই নিয়ে আমাদের 'আছি'র বোধ। আর 'আছি' কথাটা যদি হয় ধারণাতীত এই ভাসমান শূন্যতায় প্রবাহিত নৌকার মতো, তবে তাকে বেয়ে নেবার জন্য ভালোবাসাই শুধু চাই, তাই ভালোবাসা বড়ো।"[২৭]

—যে কবির কাছে 'ভালোবাসা সকলের চেয়ে বড়ো' সেই কবির কবির কবিতায় শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে 'আহত' মানুষের কথাই নেই, আছে মানুষ-প্রকৃতির কথা—

"এই যে ভলোবাসছি আমি সাতসাগরা ধরিত্রীকে,

এই যে স্নেহের সুধা, সুধায় ছড়িয়ে দিলুম শরীরটিকে—
স্নিগ্ধ সবুজ ললাট মেলে সেই সেখানে দিগন্তে সে
আপন মনে তাকিয়ে থেকে একটু খানি স্বপ্নে মেশে—
তার বুকে যে শ্রান্তিবিহীন তৃপ্তিবিহীন জ্বলছে প্রণয়
কেউ জানো তা? সে শুধু কয়, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।"[২৮]

অথবা—

"যে যে রং লাগে এই প্রাণের প্রসারে তাকে রাখো,
বিমুখ হয়ো না মগ্ন পৃথিবীর প্রাণের প্রবাহে।
...
অসংখ্য আনন্দভরে দু-হাতে জীবন দাও ওকে—
মোহ নয় মোহ নয় : এ চাওয়াই সমুদ্র অবধি।
দেখো কী মাটির মায়া দেখো কী গানের মায়া প্রিয়া,
তোমাকে এনেছি এই অপার ব্যবধি পার করে।"[২৯]

ভালোবাসার এই মায়াময়তা— নিবিড়তা বা প্রকৃতির ঘন রং— এ সবের পাশাপাশি অবস্থান করে কবির প্রার্থনা—

"আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নাও।
যদি আমি অন্যমনে অন্যপথে নিভৃত রেখায়
শালপ্রাংশু অরণ্যকে ভীরু হাতে সুপ্ত করে আনি,
যদি আমি বজ্রমূল মেঘে মেঘে উধাও উধাও
...
আমার বন্ধন থেকে তাহলে পৃথিবী মুক্তপাণি
করো। শুধু ভরে দাও পৃথিবীকে উন্মাদ কেকায়,
বৃষ্টি হোক ঝড়ে।"[৩০]

—শঙ্খ ঘোষের কবিতা ব্যঞ্জনাময়। এই প্রেমকথা বা ভালোবাসা আনুগত্যে ফেরায়, দেয় সংযমে সংহত হবার দীক্ষা-মন্ত্র।

প্রেমের আধুনিক মন-মানসিকতা বিশ্লেষণেও শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিরাবেগ। এই আধুনিক সময়ে ভালোবাসাকে নিয়ে লেখার সময় কবি কোন রকমের অকারণ জয়ধ্বনি বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বরং বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে এগিয়ে চলার পক্ষে এবং বাস্তববাদী—

"যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা বলে

দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বল্কলে।

আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা :
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন, প্রবণতা।"[৩১]

আবার তিনিই বলেন—

"দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখিওড়া ছায়া
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখাশোনা।"[৩২]

শঙ্খ ঘোষ সম্বন্ধে জীবেন্দ্র সিংহরায় বলেন—

"যে কথা তিনি বলেন— তা সব সময়ই নতুন কথা এমন নয়। কিন্তু পুরনো কথাকেও তিনি এমন তালে এমন ভঙ্গিতে বাজিয়ে নেন তা নতুন কালের নতুন কথা হয়ে ওঠে।"[৩৩]

প্রেম সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। প্রেম পুরনো কিন্তু সেই প্রেমকে যে এমন নতুন ভাবে দেখা যেতে পারে তা শঙ্খ ঘোষই সুন্দরভাবে তুলে আনলেন—

"এতো বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো শব্দহীন হও
শস্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর
লেখো আয়ু লেখো আয়ু—"[৩৪]

অথবা—

"জাল করেছে জাল করেছে ওরা আমার সই
জাল করেছে— বলে যেমন ধরেত গেলাম চোর
ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ
দেখি, এ কী, এ তো আমিই, আমি দুঃসাহসে
জাল করেছি জাল করেছি, হা রে আমার সই
জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি।"[৩৫]

আধুনিকতার সূত্রপাত বোধহয় অবিশ্বাস দিয়ে অথবা যান্ত্রিকতা, নাগরিকতার আড়ালে আছে অবিশ্বাস— বিচ্ছেদকথা। সেই বিচ্ছেদকথা— অবিশ্বাস শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কি নেই? আছে, তবে সে অবিশ্বাস বিশ্বাসের ভূমিতে আসীন—

"তোমার গলায় আমার আদরের চিহ্ন

দু-হাত বেয়ে নেমে আসে ভালোবাসার প্রতিভা
শেয়ালের ডাক
আর যত রাত বাড়ে তোমার গলায়
যে-কোনো আঙুল দেখি হয়ে ওঠে শস্ত্রময় বিশ্বাসঘাতক
গোপন আদরে তারা দিনযাপনের সব রক্ত খেয়ে যায়।"[৩৬]

শুধু 'তুমি'তে শঙ্খ ঘোষের ভালোবাসা থেমে থাকে না বা শেষ নয়, তাঁর প্রেম বলতে কোনো তাৎক্ষণিক শরীর বিষয়ক অনুভূতি বা কামনার কথাও নয়। কবির কবিতা জুড়ে থাকে এক আলাদা মায়াময়তা— এক ভিন্ন রকমের আত্মসমালোচনা আর তাতেই যেন ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছে এবং প্রগাঢ়—

"ঘরের দখল নিতে আসিনি তোমার কাছে আজ
মাটির দখল নিতে হয়। আমি শুধু আগন্তুক।
আমি শুধু নিমেশের দৃষ্টি মেখে চলে যাব ভেবে
এসেছি ভিটের কাছে শতাব্দী পেরিয়ে।
তুমি আছো,
এটুক বিশ্বাস পেলে আর সবই তুচ্ছ হয়ে যায়
এটুক বিশ্বাস পেলে কন্দরও প্রাসাদ হয়ে ওঠে
এটুক বিশ্বাস পেলে ফিরে যেতে পারি সহজেই—
স্মৃতির চেয়েও কোনো বাস্তবিক বাস্তুভূমি নেই।"[৩৭]

—এও এক ধরণের ভালোবাসা এবং তা গভীর। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রেম এসেছে খুব সন্তর্পণে— খুব সচেতনভাবে এবং মননশীলতায় ঋদ্ধ হয়ে। তিনি প্রেমের ছলাকলা-চটুলতা অপেক্ষা তার নিজের শক্তিতে বেশি বিশ্বাসী। আর সেই বিশ্বাস স্বল্পবাকে, অনুচ্চকণ্ঠে, মৃদুভাষ্যে উঠে এসেছে সুচারুভাবে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যেমন সাংকেতিক তেমনি সংরাগে প্রদীপ্ত আর সেই প্রকাশ আরও বেশি বেদনাদগ্ধ— ব্যঞ্জনাময়—

"বলিনি কখনো?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে।

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো

কোনো ভাষা নেই

...

সে কথা বলিনি? তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নীচু জবা?

শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না?''[৩৮]

কবির কবিতা ভালোবাসার সান্দ্র অনুভবময়তায় ভরপুর। কবি মানবতাবাদী-সমালোচক এবং ভালোবাসার জন্যই প্রার্থনায় বসেন। ব্যক্তিপ্রেম থেকে মানবসমাজ-প্রেমে এবং মানবসমাজ-প্রেম থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশ্বপ্রেমে—

''আবার ফিরে আসে এ রকম নিজের মধ্যে ভরে-ওঠা দুপুর
যখন মাথার ওপর নিকষকালো মেঘ
আর অগাধ পাটখেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দ চলা

...

এ কি মৃত্যু? এ কি বিচ্ছেদ? না কি মিলনেরই অপার বিস্তার?
এ কি মুহূর্ত? এ কি অনন্ত? না কি এরই নাম সন্তত জীবন?

...

শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো :
ভেবো না। ভেবো না কিছু! দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।''[৩৯]

'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার'— যে কবি এ-কথা ভাবেন তাঁর কবিতায় যে প্রেম ভাবনা তা তাঁর সমকালের অনেক কবির সঙ্গে অমিল হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। তাঁর সমকালের অনেক কবির কবিতায় পাওয়া যায় যৌনতার প্লাবন বা যৌনগন্ধী শব্দ ব্যবহারের চটুলতা— অপরদিকে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তা প্রায় নেই বললেই চলে। যৌনগন্ধি শব্দ ছাড়াও যে অনবদ্য প্রেমের কবিতা লেখা যায় তা— 'প্রতিহিংসা', 'চাবি', 'জন্মদিন' কবিতাসমূহ জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনিই তো লিখতে পারেন—

''দুপুরে রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হারালে—
তোমাকে বক্ব, ভীষণ বক্ব
আড়ালে।

...

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে—
তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব
আড়ালে।''[৪০]

অথবা—

''যতদূর পিপাসাতে এ-শরীর সাড়া দিতে পারে
আগুন জ্বালিয়ে যাও ততদূর পাতায় পাতায় তুমি সানুমূলে পাইনের বন।''[৪১]

—প্রেমের ক্ষেত্রে, ভালোবাসার ক্ষেত্রেও শব্দের পবিত্র শিখাকে যে শতাব্দীতে তাৎপর্যে নিয়ে যাওয়া যায় তা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় নজর রাখলেই দেখা যায়—

''নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।''[৪২]

এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে কবি রণজিৎ দাশের মন্তব্যটি—

''মানবিকতার মহাযাত্রী কবি শঙ্খ ঘোষ প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক আনন্দকে সমাজের মঙ্গলচেতনার পথে শামিল করেন, অস্তিত্বের অশথমূলে জেগে ওঠে গান।''[৪৩]

যে কবির কাছে নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, বরং শব্দের নতুন সৃষ্টিই অভিপ্রায়— সেই কবি ভালোবাসার কাছে পৌঁছোন এবং সৃষ্টি করেন দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নতুন প্রেম-কবিতা। প্রবল অস্ত্যর্থকতার জন্য তাঁর সমস্ত কবিতাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রেমের কবিতা— ভালোবাসার। আর এ কারণেই ভালোবাসার কবি শঙ্খ ঘোষ, বেঁচে থাকার এবং অন্যকে বাঁচতে শেখানোর কবি শঙ্খ ঘোষ। কবি এভাবেই—

''কবির আমি আর তাঁর বাইরের সমাজের মধ্যে চলে অবিরাম সংঘর্ষ, যে সংঘর্ষ থেকে কেবলই উন্মেষ হয়ে তৃতীয় একটি সত্তার। নিরন্তর এই সংঘর্ষ আর তৃতীয় এক সত্তার দিকে আবর্তনের এই পথ যেমন আত্মনির্মাণের, কবির হয়ে ওঠার, তেমনই ভালোবাসার।... ভালোবাসার সেই পথেই এই কবির সমানুভূতি, রক্ত মোক্ষণ, অপমান আর লাঞ্ছনার বোধ আর ভালোবাসার ঘাতচিহ্ন বহন করা।''[৪৪]

—'ঘাতচিহ্ন' বহন করতে-করতে আবার-আবারও গভীর বিশ্বাসে হ্যাঁ'কে সামনে রেখে পড়তে বসেন ভালোবাসার স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ—

''মাটিতে বসানো জালা, ঠাণ্ডা বুক ভরে আছে জলে
এখনও বুঝিনি ভালো কাকে ঠিক ভালোবাসা বলে।''[৪৫]

সৃষ্টির মূলে আছে যন্ত্রণা— প্রকাশের যন্ত্রণা। অতএব, স্বীকার করতে বাঁধা নেই যে, এই যন্ত্রণা, শূণ্যতাবোধ বা বিচ্ছেদের মর্মযন্ত্রণা অর্থাৎ বিষাদ-নৈরাশ্য-নিরর্থকতা-উদ্বেগ-আশঙ্কা কবিতার পরতে পরতে লেগে আছে। তবে এই যন্ত্রণা প্রকাশের ধরণ বা মাত্রা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আলাদা। এবার প্রশ্ন হল, এই যন্ত্রণা বা শূন্যতাবোধ বা বিচ্ছেদের মর্মযন্ত্রণার উদ্ভব কী কেবলমাত্র 'প্রিয়' হারানোর পরবর্তী অধ্যায়! না কি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমাজ-দেশ-কালের প্রেক্ষাপটসহ জীবনের গভীরতর পাঠ! 'প্রিয়' এবং 'প্রিয়' কে না-পাওয়া অথবা পেয়ে হারানোর পরবর্তী অধ্যায়ে যে সমস্ত কবিতা রচিত হয় তাতে যে বিষাদ-শূন্যতা লেগে থাকে— তা একটি কারণ হিসেবে ছিল এবং আছে। কিন্তু বিবর্তনের পথ বেয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করল— শোষক শ্রেণীর উত্থান-পতন-জয়-পরাজয়-বিনিয়োগ-নিয়োগ-ভোগ-দখল— স্বৈরাচারী শাসকের পতন; শিল্পবিপ্লব সহ অন্যান্য বিপ্লবের সূচনা— স্বাধীনতা; সংবিধান রচনার সূত্রপাত— শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থ-সামাজিক-আইন-বিচার-ধর্মীয় সংস্কার ও সংস্কারের আলোচনা এবং আলোচনায় উঠে এল নতুন-নতুন দিক এবং নেওয়া হল জীবনের ভিন্নতর পাঠ— এইসব কার্য-কারণেও বদলে গেল কবিতার প্রকাশ।

> "প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বুর্জোয়াদেরই শুধু নয় বরং আরও বেশি পরিমাণে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা তাদের একত্রিত করে, তা সত্ত্বেও। 'পুঁজিবাদের নিষ্ঠুরতা মানবিক বোধকে অবসিত করে। পুঁজিবাদ পুঁজির গগনবিদারী বিস্তার ছাড়া কিছুই বোঝে না। পুঁজিবাদ এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা লক্ষ করে মনীষী মার্কস অন্যত্র বলেছেন : 'বুর্জোয়াশ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং রাখালিয়া সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। বিবিধ সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উর্ধতনদের কাছে। সেগুলোকে এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিগোচর স্বার্থের বন্ধন। নির্বিকার নগদ টাকার বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি' ফলে মানুষের সকল ব্যক্তিমূল্য বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে ধনতন্ত্র। এ থেকেই মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, শ্রেণীবিভক্তি।"[৪৬]

যে সমাজে ভোগ-দখল-শাসন-শোষণ-বঞ্চনা ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সেখানে একজন হৃদয়সংবেদ্য মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন— প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা, আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা!

> "পুঁজিবাদী সমাজে সবকিছুকেই যখন পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যখন সবকিছুর মধ্যে খোঁজা হয় বিনিময় মূল্য, সেখানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের যন্ত্রণার সংবেদ থেকে মুক্ত থাকবার পথ নেই। শিল্পস্রষ্টারা সংবেদী মনের অধিকারী হন। সমকালীন জীবন,

পরিপার্শ্ব যদি ওষ্ঠাগত হয়, প্রতিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলবার ধৈর্য এবং স্থৈর্য শিল্পী যখন হারিয়ে ফেলেন, তখনই তিনি বিচ্ছিন্ন বলয় তৈরি করে জ্বরা-ক্লান্তি-বিষণ্ণতা কিংবা অবসাদ-নিঃসঙ্গতা অবক্ষয়ী চিত্তবৈকল্যে ভুগতে থাকেন। কবি টি.এস এলিয়ট, নাট্যকার বের্টোল্ড ব্রেখট, ফ্রানজ কাফকা প্রমুখ ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টার রচনায় ধনতান্ত্রিক অবক্ষয় ও ওষ্ঠাগত সময়ের চালচিত্রে বিচ্ছিন্নতার নানা ছবি অঙ্কিত হয়েছে।''[৪৭]

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী কবিদের কবিতায়— বিশেষত জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা-সংঘাত, মারি-মন্বন্তর-হানাহানি-খুনোখুনি; সিংহভাগ মানুষের বেকারত্ব-চাহিদা পূরণের অক্ষমতা; ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা; পর-পর ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল তাদের মানসিক-কাব্যিক যাপন-লেখনের শূন্যতা-যন্ত্রণাময় বেদী নির্মাণের রাস্তা পরিস্ফুট করেছে।

আপাত বিষাদ-নৈরাশ্য-শূন্যতাবোধের আড়ালে জীবনের অনুপম চিত্র আঁকার অন্যতম মহৎ কবি জীবনানন্দ দাশ। এক ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগে পৃথিবী যখন আক্রান্ত, সংশয়ে জরাজীর্ণ, হতাশা-মৃত্যুতে পরিপূর্ণ— সেই অমানিশাকালে 'হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল'-এর সময়ে 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের, নান্দীরোল'-এর মহারণকালে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''ঝরাপালক'' (১৯২৭)-এ যে নৈরাশ্যের কথা উচ্চারিত হয় তা প্রধানত সেইসব পালকের— যা 'চলে গেছে'।

''অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে পাও নাই টের;
...
চ'লে গেছে প্রিয়তম— চ'লে গেছে প্রিয়া
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন বেলা শেষে হায়
দূর অস্তশেখরের গায়।''[৪৮]

অথবা—

''ধুধু মাঠ— ধানক্ষেতে—কাশফুল বুনোহাঁস—বালুকা চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া;
মাঝপথে থেমে গেল তারা সব;

শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিহারিয়া
দূরে—দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু এক, অনন্তের শুল্ক অন্তঃপরে
অসীমের আঁচল তলে!"[৪৯]

এই 'খোঁজ' এবং কাতর আঁখি তুলে আবার খোঁজ অথচ সবটাই যেন 'মরীচিকার পিছে'—'মরুবালু'কে সঙ্গে নিয়ে 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে কথা হয়, যেভাবে! কবি একদিন খুঁজেছিল যারে—' সেই 'বনের চাতক মনের চাতক' যাকে পাওয়া হয়নি এই 'নাবিক'-এর! এইসব আপাত সরল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা 'ঝরাপালক' এর পরতে পরতে। যা ছিল শুধুই না পাওয়ার বেদনা— সেই বেদনাই কখন যেন আত্ম-বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে (১৯৩৬)। এই সময়ের উচ্চারণে যে বিষাদবোধ লেগে আছে তা 'সকল লোকের মাঝে বসে'ও একেবারে ভিন্ন; একেবারে আলাদা—

"আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয় শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়;
...
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।"[৫০]

'শূন্য মনে হয়।' কেন? কেননা—

"জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে— দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে— জন্ম দেবে বলে; ..."[৫১]

এই যেন মানব জন্মের সার্থকতা— শুধুমাত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুনের বৃত্তে আবর্তিত হওয়ার জন্য! না, কোন আলোর দিশা নেই; নেই মন-মনন-মেধার যত্ন— পৃথিবী এমন এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যে ঘৃণা-উপেক্ষা ছাড়া ভালোবাসা নেই। 'তবুও সাধনা ছিল একদিন যে ভালোবাসা;' এই 'ভালোবাসা' হয়েছে 'ধুলো আর কাদা'। ভালোবাসাহীন-হৃদয়হীন পৃথিবী যে সরল মানুষদের নয়— তা প্রতিনিয়ত নতুন করে প্রমাণ দিতে-দিতে চলেছে অনন্তের দিকে। এখানে আর কোনকিছুই

সরল নয়— 'ভাষা, শরীরের স্বাদ', 'প্রাণের আহ্লাদ', 'মাটি-জলের গন্ধ' অর্থাৎ বেঁচে থাকার সমস্ত আয়োজনই কেমন যেন বিষযুক্ত-ছল-চাতুরীতে পরিপূর্ণ! এই ছেদবিচ্ছেদের; বিষণ্ণতা-র কথা ''ধূসরপাণ্ডুলিপি'' তে উঠে এসেছে।

নৈরাশ্য-বিষণ্ণতা-বিষাদের জন্ম যে মন-মনন থেকে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়, যাপন যতবেশি চিন্তা-চেতনা-কলা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ততবেশি বিষণ্ণতা গ্রাস করেছে। তাই তার প্রকাশও হয়ে উঠেছে ঘন থেকে ঘনতর। এই শূন্যতাবোধ কী সোরেন কিয়ের্কেগার্দ প্রমুখ দার্শনিকদের 'অস্তিত্ববাদ'-এর সম নাকি পরবর্তীতে জাঁ পল-সার্ত্র 'Being and Nothingness'-এ কথিত 'Nothingness'- এর সমগোত্র? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে কবির নিজের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

> ''অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে সেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই— কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন— কবির হাতে আর নয়।''[৫২]

অতএব, স্বীকার্য কবির বোধ শিকড়ের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ তিনি নজর রেখেছেন মানব-সমাজের গভীরে এবং মানবের সৃষ্টিতে। দীর্ঘ অভিযাত্রায় এই পণ্যসমাজে পৌঁছে আর নতুন করে বলতে হয় না যে, মানুষসকল স্বাভাবিকভাবেই একক ও বিচ্ছিন্ন এক-একটি দ্বীপের বাসিন্দা— মননশীল মানুষসকল তা আরো দ্বিগুণ মাত্রায়, সব থেকেও একাকী—

> ''তবু কেন এমন একাকী?
> তবু আমি এমন একাকী।''[৫৩]

এই 'একাকী'র অসুখ যে ভেতরের অসুখ। সুতরাং, ব্যথা অনিবার্য— শুধু প্রকাশ বদলে যায়; গেছে—

> ''এই ব্যথা— এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে—
> কোথাও ফড়িঙে-কীটে,— মানুষের বুকের ভিতরে,
> আমাদের সবের জীবনে।
> বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
> আমরা সবাই।''[৫৪]

'আমরা সবাই'— নই কী!— বাংলা কবিতার ইতিহাসে এমন ব্যঙ্গময় অথচ নিদারুণ বাস্তব উচ্চারণ প্রায় বিরল।

"মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংসলয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের— বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস সাধস্বপ্ন লয় বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?"[৫৫]

ব্যাখ্যা অপ্রোয়াজন, তবুও যে ছবি পাওয়া যায় তা শিকার-শিকারীর; শোষক-শোষিতের; ভোগ-দখলের— অথচ 'কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!' আছে! অতএব, বিষাদ-নৈরাজ্যও বর্তমান; কেননা অবক্ষয়িত যাপন-বাঁচন-খাদ্যশৃঙ্খল উপস্থিত।

"ধূসরপাণ্ডুলিপির" পাতায় পাতায় যে ভালোবাসার সাধ-স্বপ্ন, বাঁচার এবং বেঁচে থাকার রামধনু; মানব জীবন-সমাজ নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা লেগে আছে তার ঠিক বিপরীতে লেগে আছে সেই সব অপরিপূর্ণতার যন্ত্রণা, কাতরতা। কোথাও ফিরে আসার বিশ্বাসভূমি নেই; আছে— 'থাকে শুধু অন্ধকার-মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' গণতন্ত্রের সরল আস্তাবলয়ে বিশ্বাসী; প্রকৃতির প্রেম ও ভালোবাসায় গড়ে ওঠা কবির জীবনবোধ মানুষের হঠকারিতা ধনতান্ত্রিক অবিমৃষ্যকারিতায় নড়ে গিয়েছিল। 'থাকে শুধু অন্ধকার,' এই উচ্চারণের আগেই কবি যে 'রূপসী বাংলা'-এর চিত্র অঙ্কন করেছেন তার নেপথ্যেও বিচ্ছেদের সুর বিদ্যমান— 'ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা— এরি মাঝে বাংলার প্রাণ।'

"ডাইনীর মতো হাত তুলে-তুলে ভাঁট আশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝিনাকো,— বুঝিনাকো চিল কেন কাঁদে;
পৃথিবীর কোন পথে দেখি নাই আমি; হায়, এমন বিজন
শাদা পথ— সোঁদা পথ— বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে —শ্মশানের পারে বুঝি;— সন্ধ্যা আসে সহসা কখন;
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম— নিম কার্তিকের চাঁদে।"[৫৬]

যে বাংলায় ফিরে আসার জন্য হাহাকারতা— তার পরতে পরতে ভাঙনের; উপনিবেশবাদের সুচারু শোষণে-শোষণে স্পষ্ট ভেঙে যাওয়া অকৃত্রিম সৌন্দর্যের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। সুতরাং, সৌন্দর্য বর্তমান কিন্তু যন্ত্রণা শিরা-উপশিরায়। এ এক 'অসম্ভব বিষণ্নতা'! অথচ উৎসব চলছে— 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে'!—

"শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি!"[৫৭]

সঙ্ঘ-শক্তি-কর্মী-সুধীদের বিবর্ণতা যেন নিয়ে চলেছে এক 'কীর্তিনাশার দিকে'! উচ্চারণে

যে বিষাদ— অনিশ্চয়তা-কুশ্রীতা-অসংগতি ধরা পড়েছে তা যুগকালে অসম্ভাব্য ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্ত পরাধীনতার সঙ্গে ছিল সারা পৃথিবীর উত্তাল হয়ে ওঠার নানাবিধ কারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বারুদের গন্ধমাখা ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সময়ে জীবন ছিল অ্যাটম বোমার মুখোমুখি! এরকম দিনে জীবন সম্বন্ধে মুগ্ধ-প্রেমিক-ভালোবাসার মানুষের হৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং নিঃসঙ্গতা গ্রাস করবে— তা অস্বীকার্য নয় এবং উচ্চারণ সম্ভাব্য—

"এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
...
পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।"[৫৮]

—'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।'— ভালোবাসার সঙ্গে হারানোর যে অপার ভয় অবস্থান করে এবং বিষণ্ণ করে সেই সুর বিদ্যামান। তবুও কবি আস্থাশীল—

"সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ,
এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল,
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত-ক্লান্তহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিমপ্রভাতে।"[৫৯]

'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কেটে গেছে! চারিদিকে এত মৃত্যু যে— 'ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন'! ভোগ-দখলের লড়াইয়ে শ্রেয়বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং মানুষের 'মানব' হাওয়া তো দূরে থাকুক— হবে সুষমিত আচরণ ও মানবীয় বোধের সুকুমার বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে ভয়াবহ! 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা— বলে যে কবি আশা করেছেন সেই কবির কলমেই নাগরিক জীবনের ছল-চাতুরীর জঙ্গলময়তা উঠে এসেছে—

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো
তবুও জন্তুগুলো অনুপূর্ব অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।"[৬০]

বিবিধ বেদনায় পৃথিবী যখন আক্রান্ত তখন শুভবোধসম্পন্ন মানুষের হৃদয়ে 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' খেলা করা অসম্ভাব্য নয়। কেননা 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' প্রার্থনীয়। কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া পৃথিবীতে কেবলই 'মৃত্যুর শব্দ' শোনা যায়; গেছে এবং 'গ্রাম পতনের শব্দ'

অর্থাৎ সরলতা-নির্মলতা পতনের!

“শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ!
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ!
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;

উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ

অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।”[৬১]

অথবা—

“অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই— প্রীতি নেই— করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।”[৬২]

এই ভয়ানককালে; ভয়াবহ আরতির মধ্যসময়ে; সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির টালমাটাল অবস্থায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা-শোষণ-বঞ্চনা-মহামারী-মন্বন্তর-হানাহানি-খুনোখুনি, বেকারত্বের চরম দুর্দশার ‘অদ্ভুত আঁধার’কালে লালসাময় মানুষের যে আদিম জিভ লকলক করে বেরিয়ে এসেছিল তা সংবেদনশীল কবিকে যারপরনাই বিষাদময় করে তুলেছিল এবং সেই সব ছবি ধরা পড়েছে তাঁর কাব্যদেহে, তবে বড় বেদনায় এবং ভালোবাসার আলোতে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার পরতে পরতে লেগে আছে অনিশ্চয়তা, বিষণ্ণতা, পরাভববোধ— হাহাকার এবং না-এর পর না-এর পাহাড়। তবে একজন সহৃদয় সামাজিক মানুষের পক্ষে তর্জনী যেমন সবসময় বিপরীত দিকে রাখা সম্ভবপর নয়; তেমনি সুধীন্দ্রনাথের বেলাতেও। অতএব, ‘সন্ধি’ করেছেন এবং যাবতীয় ‘ধ্বংসের দায়ভাগে’ নিজেকে সমানভাবে ‘অংশীদার’ ভেবেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ “তন্বী” (১৯৩০)-এর সমকালে অর্থাৎ একটি বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বস্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে;

যুদ্ধে-যুদ্ধে ক্ষয়ে যাওয়া মাটিতে পা রেখে সামাজিক ও ব্যক্তিকভাবে যে কোনো মানুষই আর হার্দিকভাবে আশ্রয়ের নীড়ে অবস্থান করতে পারেন না— সেই আশ্রয়হীন বিশ্বাস খোয়ানো সরল উচ্চারণসমূহে বিষাদ-ছিন্নতার সুর বর্তমান— 'কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হতে'! এই হারানোর যন্ত্রণাই প্রধানরূপে দেখা দিয়েছে পরবর্তীতে— যা ব্যক্তিগত সীমা পার হয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকার মানচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে।

> ''মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
> সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।—
> আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
> সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে;
> ...
> আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
> বৈধব্যের অকাল বিপাকে।''[৬৩]

অতএব, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, উচ্চারণে নিরাশ্রয়তা কেন্দ্র, 'সন্ধিলগ্ন' অধরা এবং বর্তমান বড় বেদনাময়। এক শ্বাসরোধ করা বেদনাবোধ উপস্থিত— যা সমস্ত সংশয় অতিক্রম করে ভবিষ্যৎকেও বেদনাবিধুর বিষণ্ন করেছে।

> ''কবিতাগুলিতে একটা রুদ্ধশ্বাস দুঃসহ বেদনাবোধ আছে যেটাকে সুধীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় 'ভবিতব্য ভারাতুর'। 'ভবিতব্য' কথাটি বার-বার ফিরে আসছে শুধু 'অর্কেস্ট্রা'য় নয়, অন্য দুটি গ্রন্থেও, কিন্তু আমরা অদৃষ্টবাদ বলতে যা বুঝি এ ঠিক তা নয়, এতে পরলোকের আশা নেই, পরজন্মের আশ্বাস নেই, একে বলা যায় পেগান মনোভাব, অন্ধ, অধার্মিক, আধিভৌতিক, নির্মম অনতিক্রম্য নিয়তিচেতনায় পরিপূর্ণ।... কোনোদিকে কোনো সান্ত্বনা নেই তাঁর, কোনো আশা নেই, আশ্বাস নেই, মুক্তি নেই। আসক্তি তাঁর দুর্মর, বিরহ তার নরক, প্রশান্তি তার মৃত্যু।''[৬৪]

''অর্কেস্ট্রা''য় বেদনার যে ড্রাম বেজেছিল; সঙ্গত দিয়েছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভায়োলিন সেই সুরের তাল-লয় আরও বেশি তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠেছে ''ক্রন্দসী''তে (১৯৩৭)। তবে এইসব রিক্ত-হতাশাময়; 'কাম্য শুধু স্থবির মরণ'— উদ্বিগ্ন, বিষাদময় উচ্চারণ একই সঙ্গে ব্যক্তি সামাজিক বিষাদময়-নৈরাশ্যের উচ্চারণ হয়ে ওঠে এবং আত্মসমালোচনাও করে থাকে—

> ''ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
> মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
> অখিল ক্ষুধায় শেষে কী নিজেকে খাবে?

কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।''[৬৫]

প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা একই শরীরে বর্তমান অর্থাৎ কবির দ্বৈতসত্তারই 'আমি' ও 'তুমি'। পরিবর্তিত পৃথিবীতে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' মুখ থুবড়ে পড়েছে অসহায় একা— যেখানে একটি বিশ্বযুদ্ধের অভিনয় শেষ হতে না হতেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ মঞ্চস্থ হওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেখানে পালানোর অবকাশ বা জায়গা কোথায়? এই নিষাদকালে মানুষ বড় অসহায় হয়ে উঠেছিল এবং একা—

''কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।''[৬৬]

এই একা'র কালে সমস্ত সত্তা ক্ষয়ে যাবার নিবিড় মুহূর্তে— 'আমি একা, আজ আমি একা।' উচ্চারণ যেমন বেদনাময় তেমনি বিচ্ছিন্নতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত। এহো স্বীকার্য কিন্তু আগে হল— ভাঙন! যে ভাঙন সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি ইত্যাদির চিরাচরিত পথ অতিক্রম করে মূল্যবোধ-ভালোবাসা-প্রেমকেও ঠুনকো করে তোলে; ভেঙে যায় পাতলা কাচের মতো। এই ডামাডোলপূর্ণ সময়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী বা সংগ্রামী মানুষদের স্বপ্ন পাতলা কাছের থেকে ঢের পাতলা হয়ে ভেঙে যায়। পাশবিক হিংস্রতার বলয় অতিক্রম করেও নামমাত্র স্বাধীন বা মানসিক বলয়ে পৌঁছানো যেন! এই চাওয়া এবং না-পাওয়ার পুড়ে যাওয়া সময়ে—

''আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তরে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।''[৬৭]

স্বাভাবিক ভাবে নয়; কেননা যে পৃথিবীতে হিটলারের আস্ফালন, যেখানে 'মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্বরের মতো', শান্তি সম্মেলন ক্ষমতাধারী দেশসমূহের আড্ডার জায়গা। সেখানে একজন সহৃদয় সামাজিক মানুষের উচ্চারণ বিষাদগ্রস্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

''প্রথমে বলি, জীবনে আশা-নিরাশার এই দ্বিকোটিক বিভাজনায় আমার তেমন সায় নেই। অনেকসময় ওসব জড়িয়ে থাকে একই সঙ্গে একই মনে। যেমন ধরো, একেবারে সাম্প্রতিক একটা ঘটনা বাংলার বিস্তীর্ণ কিছু অঞ্চল ধ্বস্ত হয়ে গেল আয়লায়, মানুষজনের কষ্টের শেষ নেই। বিপুল জায়গা জুড়ে বিপুল সময় জুড়ে

ত্রাণ পুনর্জীবন পুনর্বাসন ত্বরিত ব্যবস্থার দরকার। মানুষ তখন কী করে? অন্য সবকিছু ভুলে যে যার সাধ্যমতো একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সরকার অপ্রস্তুত, দিশেহারা। অন্য অনেকে সরকারের ওপর দোষারোপে ব্যস্ত। পথচলতি ত্রাণসংগ্রহের কাজে হরেকরকম দলাদলি, সন্দেহ, বিষোদ্‌গার। তখন এই ভেবে ভয়ানক একটা হতাশার বোধ তৈরি হতে পারে যে, এমন এক বিপর্যয়ের মুখেও পীড়িত মানুষের দুর্ভোগের চেয়ে আমাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠছে নানা রকমের খুচরো হিসেব। কিন্তু হতাশার সেই একই মুহূর্তে যখন দেখি রাজ্যের এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে কত স্বেচ্ছাসেবী দল নিজেদের জোটানো সামান্য সম্বল নিয়েও চলেছে ত্রাণকাজে, যখন দেখি রাস্তার কোনো জীর্ণবসনা মহিলা দূর থেকে এগিয়ে এসে আঁচলের খুঁট থেকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দেন, যখন দেখি আর্তরা এই ভয়ংকর সময়েও নিজেদের জন্য ত্রাণ না নিয়ে প্রথমে এগিয়ে দেন অন্যদের, নতুন একটা ভরসায় তখন ভরে ওঠে মনটা। একই সময়ে হতে পারে এসব। একই দিনে হতে পারে দুই বিপরীত অনুভব।... বেদনাবোধ, বিষণ্ণতা আর অন্ধকারের কথা আমরা অনেকসময় নিরাশাকে এরই সমার্থক ধরে নিই। সেটা বোধহয় ঠিক নয়। বেদনাবোধ বা বিষণ্ণতা একটা স্টেট অফ মাইণ্ড, আর নিরাশা একটা স্টেটমেন্ট। বিষাদ বা বেদনাবোধের মধ্যে অনেক কিছু একসঙ্গে জড়ানো থাকতে পারে। আর অন্ধকার? ভেবে দেখো, কীভাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাবইয়ের নাম হতে পারে ‘যে আঁধার আলোর অধিক’, বিষ্ণু দে-র বই ‘সেই অন্ধকার চাই’। রবীন্দ্রনাথের বহুতল অন্ধকারের কথা আর না-ই বা তুললাম এখানে। ওসব তো নিরাশার কথা নয়। অবশ্য বলছি না যে ঠিক ওই আঁধার বা অন্ধকারটাই আমারও কথা। বলতে চাই— একটু আগে যেমন বললাম— আশা-নিরাশায় জড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা সত্তা-অবস্থান তৈরি হতে পারে।”[৬৮]

—শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় আপাতবিপরীত জীবনকথাসমূহকে বহুতলে, ব্যাপকতর বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন— তাতে হৃদয়-মেধা-জাদু-যুক্তি-রহস্য-স্বচ্ছতা-ব্যক্তি-সমাজ-ক্ষমতা-ক্ষোভ-নম্যতা-বিদ্রোহ-আসক্তি-বিদ্রুপ-অন্ধকার-আলো পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে ধাবিত হয়েছে সমগ্রের দিকে। এই সমগ্রতায় সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা নিয়তই ব্যস্ত ‘হ্যাঁ’-এর খোঁজে কিন্তু ‘বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা’— পৃথিবীকে অনেকদিন না দেখার আন্তরিক ব্যথা; যেখানে ‘মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—’ ‘কোমলতাগুলি’ বিবর্ণপ্রায়, যেখানে ‘ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা’! স্বীকার্য, তাঁর কবিতার বিষাদ-শূন্যতাকথা— তবে 'alienation' নয়, তিনি নিজে বিচ্ছিন্ন নন তাঁর কবিতায় বিচ্ছিন্নতার চিত্র অঙ্কিত আত্মযুক্তভাবে। বিষাদ-শূন্যতার

কথা বাঁচার কথায় শেষ হয়। সমস্ত নেতির মধ্যে ‘হ্যাঁ’ দেখেন, বিশ্বাস করেন আলো ‘আছে— আছে কিন্তু। হয়তো অল্প তবুও আছে।’ সমস্ত পরাভব তাঁর কাছে এসে জয়ের যাত্রা পায় এবং সমস্ত গ্লানি-হিংসা-মারামারি-খুনোখুনি-‘জীবন অন্ধকার করে দেওয়া’ থেকে মুক্তির কথা ভাবেন— ‘মুক্তি যে নেই, এতটা ভাবতে ইচ্ছে করে না’। প্রশ্ন হল— একজন কবি যখন ‘হ্যাঁ’, ‘মুক্তি’-এর কথা ভাবেন তবে নিশ্চয়ই ‘না’, ‘বন্ধন’— বিষাদঅন্ধকার কোথাও আছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে বিষাদ-অন্ধকার মূলত চারদিক থেকে আসা— প্রেমহীনতা থেকে অথবা পরস্পর পরস্পরের দূরত্ব থেকে, দেশভাগ থেকে, সমাজ-দেশ-কালের বিসংগতি থেকে এবং আত্মহীনতা থেকে।

> ‘‘আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
> যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
> কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব বলে
> এই দুই চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।’’[৬৯]

তাঁর আদিমতম কবিতা ‘কবর’ লেখা হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে, কলকাতায়। ৪৬ সালে ‘যুগান্তর’-এ প্রথম কবিতা ছাপা অক্ষরে বের হয়, কিন্তু—

> ‘‘কিন্তু কবিতা যে কেবল মিল মেলানোর খেলা নয়, সময় কাটানোর উপকরণ মাত্র নয়, তার হদিশ পেতে শুরু করেছিলাম সেই পনেরো বছর বয়সেরই একটা অভিজ্ঞতায়। তিনজন বন্ধু তখন ঘুরে বেড়াতাম একসঙ্গে। কখন একবার মনে হলো আমাকে যেন উপেক্ষা করে অন্য দুজন অনেক দূরের হয়ে গেছে। খুবই একটা কষ্টের বোধ হল। আর লিখবার কথা কিছুমাত্র না ভেবেও কবিতার লাইন উঠে আসা, সেটাও ঘটল সেই প্রথম।’’[৭০]

—‘খুবই একটা কষ্টের বোধ হলো’! অতঃপর আগে এবং পরের অজস্র ঘটনারাশি— পদ্মাপারের রেলওয়ে কলোনি, পাকশীর ‘চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ’, থেকে ‘স্বাধীন আর খণ্ডিত দেশের কলকাতায় এসে’ পৌঁছানো পনেরো বছর বয়সে। এই যুদ্ধ আন্দোলন-দুর্ভিক্ষ-উন্মাদনা-দাঙ্গা-দেশভাগে কবির অন্তরে যে বিষাদের বীজ রোপিত হয়েছিল তার ফলাফল— বিষাদ-উত্তীর্ণ কবিতা। তাঁর ‘খুবই একটা কষ্টের বোধ হলো’ এর মর্মমূলে ছিল বিচ্ছেদ— বন্ধু বিচ্ছেদ। অর্থাৎ একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের বিচ্ছেদ অথবা প্রেম থেকে প্রেমহীন হবার বেদনা। এই বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে নিয়ে এসেছে ভালোবাসার নির্মল দুয়ারে।

> ‘‘আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে, ভয়ে কাঁপে দূর-দূরান্তর।
> কত বলি, কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে কোরো না কোরো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অন্তহীন

সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।
কত বলি, শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ়-ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল
বৃন্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু
যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।”[৭১]

অনতিক্রান্ত বিচ্ছিন্নতা নয়, ‘রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।’ যদিও ‘একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে’! যেখানে ব্যথা বোঝার মানুষের উপস্থিতি কম, চতুর্দিকে চতুর আর নষ্ট আলো, সজলতাহীন জীবন— ভালোবাসাহীন। মানুষ প্রতিনিয়ত মানুষের অপমান মুখ বুজে সহ্য করে এবং অপমান করে— মিথ্যে আর মিথ্যের জাল! এই বিচ্ছিন্ন বিষাদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া স্বাধীনভূমিতে প্রগাঢ় ভালোবাসায় লেখেন—

“তার কোনো খ্যাতি নেই তার জন্মপরিচয় নেই
তার কোনো মুক্তি নেই লোকে যাকে মুক্তি বলে থাকে
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কম্বল, পশম
আর কোনো ঢেউ নেই ঢেউয়ের সংঘর্ষে দ্যুতি নেই।
জীবন এত যে ভালো, সে-জীবনে অধিকার নেই
লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই
সারি সারি উট আর উটের চোখের নীচে জল
দু-হাত বাড়িয়ে দেখে আর কোনো জলচিহ্ন নেই তবু সে এমনভাবে কোন্
স্পর্ধা করে বলে যায়
আমার দুঃখের কাছে তোমাদের নত হতে হবে!”[৭২]

তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ভালোবাসাতে, বেঁচে থাকাতে। তাই তাঁর কাছে ভালোবাসাহীন যন্ত্রণাময় অঞ্চলে বড় আধুনিকতা গভীর-গাঢ়তর ভালোবাসা।

উঁচু স্বর-ঘোষণা নয়, শব্দ-বাক্য ভারাক্রান্ত সদম্ভ উচ্চারণ নয়— কেবল ‘নীরবতা’, কেবল বটবৃক্ষের ছায়া সমান আশ্রয়দান। সমস্ত ভাঙন, সমস্ত মৃত্যু-ক্ষয়-পরাভব-পরাজয়-অপমান-রুক্ষতা-বধিরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতা আরও ‘বেঁধে বেঁধে’ থাকার কবিতা—

“আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু

পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে
আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!
আমরাও তবে এইভাবে
এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?
আমাদের পথ নেই আর
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।”[৭৩]

অথচ মুহূর্তে-মুহূর্তে ‘মানুষেরই কাছে ক্ষমা চেয়েছিল মানুষ’! পাঁজরে বেজেছিল দাঁড়ের শব্দ— অতীতহীন-ভবিষ্যৎহীন! শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় সেই না-ভালোবাসার গ্লানিকে সম্পূর্ণ চিনিয়ে দেন এবং উত্তীর্ণ করে নিতে চান পরম-ভালোবাসার উজ্জ্বল আলোয়, স্নান করিয়ে নিতে চান সেই বৃহৎ-মহৎ ভালোবাসার জলে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির কথা সচেতনভাবে উঠে এসেছে। তাই তাঁর কবিতাসমূহ একই সঙ্গে প্রেমের কবিতা, জীবনেরও কবিতা আবার আত্ম-বিষাদের হয়েও আত্ম-মুক্তির কবিতা। ‘এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা’-এর পরেও জীবনানন্দ দাশ যেমন দেখেছেন— ‘ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি’, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ‘সন্ধি’ করে নিয়েও যাবতীয়

'ধ্বংসের দায়ভাগে' নিজেকে সমানভাবে 'অংশীদার' ভেবেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ এই নিষাদকালে দুঃখে-ক্রোধে, তিক্ততায়-মাধুর্যতায় কখনো নিজের হাড়-উৎসর্গ করার কথা ভেবেছেন আবার কখনো-বা প্রার্থনা-দোয়ায় বসেছেন; চরম-অসহায়কালে নিজেকে 'আরুণি উদ্দালক', 'জাবাল সত্যকাম' ভাবতেও পিছপা হননি আবার সমস্ত দায়ভার নিয়ে আত্ম-সমালোচনাও করেছেন নিয়ত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) থেকে সেই সচেতনতা পরিলক্ষিত— বিস্তারিত সময়ে-সময়ের ক্রমবর্ধমান চলমানতায়।

''রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা
টানাটানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা
থামল না আর মরুবালুর হাঁটা!
...
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।''[৭৪]

—সামাজিক বিসংগতির ছবি কবিকে যারপরনাইভাবে ব্যথিত করেছে। কবি দেখেছেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও মানুষের পরাধীনতা— ভিটেমাটি, ভাত, কাপড়, স্বাস্থ্যের জন্য হাহাকারময়তা। কবি দেখেছেন একটি স্বাধীন দেশে কীভাবে ভাতের জন্য মিছিল চলে এবং তাতে পুলিশি অত্যাচারও চলে! বাঁচতে চেয়ে প্রাণহীন হয়! রাস্তায়, পথে-ঘাটে মানুষ মানুষকে অপমান করে এবং অন্যের অপমানিত মুখ দেখে অনাধুনিক আনন্দ পায়! অথচ

''বলে গিয়েছিল বটে, আছে কি না-আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন-দুহাত জোড়া নীল শিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর?''[৭৫]

১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং পুলিশের গুলি-চালনা, ১৯৫১ সালের কুচবিহারের খাদ্য আন্দোলন— পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু, ১৯৫৩ বেকার-ছাঁটাই বিরোধী মিছিল, কৃষক সমাবেশ, ১৯৫৯ খাদ্য আন্দোলন, ময়দানে কৃষক সমাবেশ— বহু সংখ্যক মৃত্যু, ১৯৬১ ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমন, ১৯৬৪ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৭ নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা, ১৯৬৮ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন, ১৯৭০ নকশালবাড়ি আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার— কবি শঙ্কর চক্রবর্তী, সমীর মিশ্র, সুদেব চক্রবর্তীকে নির্মমভাবে খুন করা হয়, ১৯৭১-কবি ও গল্পকার তিমিরবরণ সিংহকে খুন করা হয়, মুরারী চট্টোপাধ্যায়কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়— যথাক্রমে বহরমপুর জেল এবং হাজারীবাগ জেলে। ১৯৭২ নকশাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা চারু মজুমদার— পুলিশ কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতন এবং হত্যা, ১৯৭৩ গ্রামে-গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার— হত্যা-খুন-জখম, ১৯৭৯ মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশের হামলা! ২০০৭ নন্দীগ্রাম ঘটনা! ১৯৫১ সালে কুচবিহারে যখন খাদ্যের জন্য আন্দোলন অব্যাহত তখন অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়, নিয়মসম্মতভাবে প্রথম আদমসুমারী, ১৯৫২-তে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা— অতঃপর এক নির্বাচন থেকে আরেক নির্বাচন। এক দল থেকে আরেক দলের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর— বাংলার যদি এই অবস্থা হয় ভারতবর্ষের অবস্থায় কেবল দলনামে ভিন্ন কিন্তু অবস্থা প্রায় সমান অর্থাৎ খাদ্য আন্দোলন, মৃত্যু মিছিল, হত্যা-গণহত্যা, ধর্ষণ-গণধর্ষণ— একজন সহৃদয় সামাজিক কবিকে হতাশ করেছে। একত্রিতভবে রাজ্য দেশ— আন্তর্জাতিক চিত্র। কেননা তিনি লেখেন সমগ্রের বোধ দিয়ে। ১৯৫১ সালে যে কবির হাতে সৃষ্টি হয় 'যমুনাবতী', সেই কবি সাতের দশকে লেখেন—

> ''কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
> কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
> চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
> বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!
> ...
> না কি এ শরীরের পাপের বীজানুতে
> কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
> আমরাই বর্বর জয়ের উল্লাসে
> মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?''[৭৬]

২০০৭ সালে তাঁকেই লিখতে হয়—

> ''আমি তো আমার শপথ রেখেছি
> অক্ষরে অক্ষরে

যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।

দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা।

গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা—
বজ্রকঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা।

যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে—
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।''[৭৭]

২০১০ সালে লিখতে হয়—

''কৃপাচার্য বললেন : 'এ হয় না, হতেই পারে না।'

'কেন নয়? যুদ্ধে কিংবা প্রেমে
কিছুই অনীতি নয়। শত্রুর নিধন চাই
ছলে বলে অথবা কৌশলে।'

'শত্রু বটে, তবু এক হিসেবে
আত্মজনও নয়?'

'আত্মজন? নিদারুণ সংহারসময়ে
তারা কি ভেবেছে আত্মজন? তাদের চলার পথ কেবলই কি
ন্যায়পথ ছিল? কে কবে কখন

ন্যায়পথে যুদ্ধে জেতে বলো? যে-শকুন
দূর থেকে লক্ষ্যে রেখেছিল কখন বায়সশিশুগুলি
গাছের কোটরে
ঘুমের ভিতরে ঢলে পড়ে, আর সে-সুযোগে
নিমেষেই প্রতিটিকে ছিন্ন ছিন্ন করে দেওয়া যায় সামান্যত প্রতিরোধহীন
তার পথই যে-কোনো যুদ্ধের পথ।
হে মাতুল, দ্বিধা নয়, অন্ধকারে ঘিরেছে সময়
এসো আমরা হত্যামন্ত্র নিয়ে
অস্ত্রহাতে ঢুকে পড়ি অতর্কিতে ঘুমন্ত শিবিরে।'

কাকেদের মাংসকণা কাছেদূরে গাছ বেয়ে তখনও গড়ায় ধীরে ধীরে।''[৭৮]

জ্বলে ওঠে ''গোটাদেশজোড়া জউঘর'' (২০১০)! ২০১২-তে লেখেন— 'ছেলের তর্পণ করছে বাবা'—

''সত্যি কি নিয়েছি কাছে? হৃদয়ে মেনেছি কোনো দায়?
না কি শুধু হিমকরা উদাসীনতায়
বয়ে যেতে দিয়েছি সময়
আর আজ মধ্যরাতে ঘুমহারা অন্ধকারে অপরাধবোধে হই ক্ষয়?
...

যদিও উদ্‌ভ্রান্ত আজ, তবু পার্টি ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তি কতটুকু ব্যক্তি থাকে?
একা একা কে সে?
কোন্ মৃত্যু তারও চেয়ে কম মৃত্যু হতে পারে পোড়া এই
মৃত্যুমুখী দেশে?

প্রশ্ন করে যায় নচিকেতা। প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে।
নচিকেতা প্রশ্ন করে, অন্যমনে থেকে তার উত্তর পারিনি কিছু দিতে
হৃদয়ে নিইনি কোনো দায়
বলেছি বরং অনাদরে
'চল তোকে দিয়ে আসি একাকীর দোরে'।

সব প্রশ্ন ফেলে রেখে আচম্বিতে গিয়েছে সে সরে।

তার পরে কিছু দূর দেখা যায়, কিছু যায় না-বা।
শব্দহীন অন্তরালে আবছা এক দৃশ্য জেগে থাকে :
অপরাধভারে কিছু নত,
প্রসারিত দুই হাত অঞ্জলিতে বাঁধা,
গঙ্গার পিঙ্গল জলে আজানু দাঁড়িয়ে আজ ছেলের তর্পণ করছে বাবা।''[৭৯]

শাসক-শোষকের কারণে যে মৃত্যু-ক্ষয়-অপমান-বঞ্চনা এবং তার ফলহেতু বিষাদ— এই বিষাদস্থানে কবির ক্রোধ-ক্ষোভের সঙ্গে রয়েছে আত্মসমালোচনা। নিজের মুখের সামনে নিজেই তুলে ধরেছেন আয়না— যাতে স্পষ্ট হয় কোথায় রক্তের দাগ আর কোথায় কালশিটে চোট! এইসব স্মরণীয় কিন্তু আগে হল— তাঁর বেদনা উপশমের প্রেমের পথ, যেখানে সমস্ত পোড়াস্থানে ও ভস্মমুখে নির্মল আলোকরশ্মি এসে পড়ে। তা সে হোক রাষ্ট্রিক ঘাত-অপমান অথবা মানুষ মানুষকে করা অপমান-আঘাত থেকে উৎসারিত বিষাদ-শূন্যতা। তাঁর 'যমুনাবতী', 'বাস্তু', 'ভিড়', 'সঙ্ঘ', 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ', 'যাব না সাগরে', 'ভাষা', 'ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও', 'আরুণি উদ্দালক', 'জাবাল সত্যকাম', 'কলকাতা, 'শব্দের প্রকৃতবোধ', 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', 'আয়ু', 'বাবরের প্রার্থনা', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', 'শ্লোক', 'চডুইটি কীভাবে মরেছিল', 'লজ্জা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'ক্যান্সার হাসপাতাল', 'অন্ধবিলাপ', 'শিশুরাও জেনে গেছে', 'তুমি কোন্ দলে', 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার', 'শহিদ শিখর', 'জলই পাষাণ হয়ে আছে', 'সে অনেক শতাব্দীর কাজ', 'দ', 'দেশান্তর', 'দায়', 'বক', 'ভালো', 'সার্থক', 'পলিটিকালি', 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ', 'দেখা', 'আমরাই তা পারব একদিন', 'মাওবাদী', 'লজ্জা হয় ভেবে', 'ইতালিতে কবি', 'নৈশ সংলাপ'— কবিতাসমূহে একই সঙ্গে বিষাদ এবং বিষাদ-উত্তীর্ণ স্বর উপস্থিত। মূলত, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আহত মানুষের বেদনার কথা সময়ে-সময়ে উঠে এসেছে— সেই সংকটকথার উত্তরকথা হিসেবে উঠে এসেছে ভলোবাসার কথা, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের গাঢ়-সংলাপ।

> ''আজকের সভ্যতা প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিক্ষেপ করছে বিচ্ছিন্নতার গহ্বরে। সেই না-আছি থেকে আছিতে পৌঁছবার জন্যে ক্রমানুয়ে প্রয়াস করতে হয় আমাদের, সেই প্রয়াসের নামই, শঙ্খর ভাষায় 'নিজের মধ্যে ভালোবাসবার ক্ষমতা গড়ে তোলা'।
>
> হ্যাঁ, ভালবাসা পেতে চাওয়া নয়, ভালবাসতে চাওয়া। অস্তিত্ব-সংকটের উত্তর সেইখানেই, সেই চাওয়া তাই প্রায় যেন এক সংকল্পের মতোই উচ্চারিত হয় একটি কবিতায়, ক্রিয়াপদ প্রয়োগের ধরণ সংকল্পের ভাবটিই প্রকাশ করে :

লিখে ফেলতে হবে যে সময় হয়ে এল, জড়িয়ে নেবার সময়
উঠে পড়তে হবে এবার
কোনো কাজ আর ফেলে রাখবার নয়
নিচু হয়ে জলের ছায়ায় দেখে নিতে হবে সবার মুখ।

ভালবাসতে চাওয়ার এই সংকল্পে আমাদের বাঁচার বলয় প্রয়াস পায়, স্থানগত দূরত্ব কিংবা শ্রেণিগত দূরত্বের বাধা ভেঙে দিতে পারে সে-প্রসার। 'কোবালম বিচ' কিংবা 'দুধপাতিল' কিংবা 'শিলচর' স্থানগত বিচ্ছিন্নতা-অতিক্রান্ত ভালবাসার কবিতা— 'এইখানে পা রেখে জানি মিথ্যে এ ছিন্নতা।' এ-কথা বিশেষ করে উচ্চারণ করতে হয় এইজন্যে যে আমাদের দেশের দিনানুদিনের বাস্তবে এই ছিন্নতা যে বড়-বেশি ভয়ানক সত্য, আমাদের যাপনে বড়-বেশি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। বিশেষ করে যে-মানুষটি সংযোগ চাইছেন তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে, তাঁরই যে এ-যন্ত্রণা সবচেয়ে প্রখর। এই যন্ত্রণাভোগই তাঁর দেশচেতনার সাক্ষ্য:

জয়ধ্বনি তোলে নিশান আমার নিশান তোমার নিশান
ভল্ল? না কি মুষল? না কি ঘাস?
আমাদের এই পায়ের নিচে ভিন্ন সব জলস্রোত
তাপ্তি আর কৃষ্ণা আর গঙ্গা।

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের পায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে।

না, দেশ আমাদের কোনও মাতৃভাষা দেয়নি, আমরা কেউ কাউকে কিছু বোঝাতে পারি না, 'সবাই সবার পাশ দিয়ে যাই কেউ কাউকে দেখতে পাই না'— দেশ-পরিস্থিতির এই সঞ্চারহীনতার দিক, বিযুক্তির দিকই এ-কাব্যে বিশেষভাবে উপস্থিত রয়েছে, এ সংযোগের কাব্য বলেই। কোনও-কোনও কবিতায় আছে দেশের 'ভাসমান' বাসিন্দার কথা, যাদের কবি শ্রেণিগত দূরত্ব থেকে দেখেননি, দেখেছেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদেরই মুখচ্ছদ নিয়ে, 'মন্ত্রীমশাই' কিংবা 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কিংবা 'বাবুদের লজ্জা হলো'-র কবিতায়।"[৮০]

শঙ্খ ঘোষ সমাজ দেশ কাল সচেতন রোম্যান্টিক কবি— সৃষ্টির গায়ে যন্ত্রণা আর প্রতিবাদ, সমালোচনা আর আত্মসমালোচনা কালের শরীরে দাগ কেটে-কেটে বর্তমান। তাঁর দৃঢ় প্রতিবাদ, কঠিন-কঠোর-তীক্ষ্ণ সমালোচনা-আত্মসমালোচনা, সংযমী বাক্ প্রবণতা এবং নীরবতা দিয়ে সমস্ত

অহংকে ভেঙে চুরমার করা নিজেকে আরসকলের থেকে আলাদা করেছে। এই আত্মসচেতন কবি ‘আমি’ কে এমনভাবে কবিতায় তুলে ধরেছেন তাতে প্রেম-সমাজ-কাল-আত্ম ধরা পড়েছে, আত্মহীনতাও। এই আত্মহীনতার নেপথ্যের কারণ ভোগ-প্রতিবাদহীনভাবে টিকে থাকা, মিডিয়ানুসারে টিকে থাকা। কবি এই অবস্থাকে তাঁর ‘চাবি’ কবিতায় অনন্যসাধারণভাবে অঁকেন— আত্মসচেতন বলে এই ‘জাল— সর্বনাশের চাবি’ নিয়ে যাপনে যাপনে টিকে থাকা, অন্যেরা যেটাকে ভাবেন বেঁচে থাকা— কবির বিষাদের অন্যতম কারণ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘‘দিনগুলি রাতগুলি’’ (১৯৫৬)-এর ‘কবর’ কবিতাতেই তাঁর উপলব্ধি হয়েছে— ‘ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা’! তাঁর ‘আধখানা মুখ’ বাইরে আর ‘আধখানা মুখ’ ভেতরে রেখে ‘আমি’-র বহুমাত্রিক তল সৃষ্টি করেন এবং তাতে সময়ের স্বর অর্থাৎ মানুষের আত্মহীন আত্মভাবনা অঙ্কিত হয়— যা কবিকে বিচলিত করে এবং বিচলনের ফলে নির্মিত হয় তাঁর কবিতার জগৎ।

‘‘আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ
সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।’’[৮১]

—‘মানুষ কি পটভূমি জানে?’ অথবা জানার চেষ্টা করে? বুদ্ধদেব বসু যেভাবে বলেছেন— ‘আমার দুর্ভাগ্য এই সকল জেনেছি’, জীবনানন্দ দাশের যে অপার ‘বিস্ময়’ বর্তমান— সেইসব যেন অতীত! আরও অতীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্রের শুভ-বোধ, অশোক-বুদ্ধের জীবনবোধ! অথবা ভারতের স্বাধীনতার সময়কাল! জানে না বা জানার চেষ্টা করে না। বেশ অনায়াসে চলছে ছদ্মের সংসারে কানামাছি খেলা! কবি শঙ্খ ঘোষ এখানেই ব্যতিক্রম— আর তা প্রথম থেকেই, দিনে-দিনে বেড়েছে তাঁর জানার পরিধি। বিবর্তন লক্ষ্যণীয়— কবি যে পৃথিবীকে কতদিন, কতকাল দেখেননি এবং দেখে কেঁদে উঠেছেন— ‘এ কোন্ দেশ?’ মৃত্যু, শিবির! যেন ‘ভুল মানুষের অরণ্য’। জানার পরে—

‘‘আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

এখনও যে ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও—
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।’’[৮২]

দেখেছেন ‘সুন্দরী’র ছলা-কলা-কৌশল, কিন্তু হায় মানুষ— ভুলে যায়, সহজেই ভুলে যায়! বেঁচে থাকা বড়বেশি বিচ্ছিন্ন, আত্মরতি-সুখের, মিথ্যে— মিথ্যেময় বাচালপনায়। কবির যন্ত্রণা এই অবস্থায়, কেননা তাঁর ‘সবকিছুই খুব তীব্রভাবে মনে থেকে যায়’, প্রতিদিন বাঁচেন ‘সত্যি’ আর যোগের মধ্যে— পণ্যপ্রিয়তার সমস্ত চক্রান্ত থেকে দূরে। তাই মেকিময় কথা-বাঁচা নয়, খিড়কি দিয়ে দেখা নয় ‘বিপ্লব কতদূর?’, ‘বড়ো বেশি ব্যক্তিগত হাওয়া’ নিয়েও দিনযাপন নয়— তাঁর বেঁচে থাকা জেগে থেকে, আত্মে, প্রার্থনায়, নিজস্বতায়।

> ‘‘দাহকাজ সাঙ্গ করে যে যার মতো ফিরে গেছে সবাই
> গোটা পাড়া শুনশান
> কাছেই শেয়াল ডাকছে
> ঘরের পাশে লেগে-থাকা রক্তদাগ মুছে নিতে নিতে
> বিড়বিড় করছে দাওয়ায় বসে-থাকা একলা বুড়ো
> জেগে থাকাও
> জেগে থাকাও একটা ধর্ম।’’[৮৩]

শঙ্খ ঘোষ নিয়তই আত্মযোগহীনাঞ্চলে আত্মখোঁজ করেন।

> ‘‘ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক’— এই উক্তির মধ্য দিয়েই শঙ্খ ঘোষের হৃদয়কে, মননকে পড়ে নেয়া যায়। খুবই মানবোচিত এক আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানকে কবি চেনেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত। স্বপ্নহীন এক পৃথিবীতে আমাদের বাস, আর সময়ের সাথে সাথে সত্যকল্পনা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। আমাদের সময়,— ‘তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই কেবল দংশন’— এই দংশন জ্বালায় কুঁকড়ে যায় মানুষের দীন আত্মা, আমাদের দুর্বল জীবন, কিন্তু কখনও দু’একটি আত্মা আবার জেগে ওঠে— অন্ধকারে ঘন্টাধ্বনি শুনে এগিয়ে যায় সেদিকে।... তিনি সময়ের ইতিহাস-সচেতন কবি। সময় যত এগোচ্ছে বিশৃঙ্খলা ততই বাড়ছে, কবি অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল টুকরোগুলো মানুষকে চিনিয়ে দিতে চান এবং তাদের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে এনে জীবনকে নতুন একটা রূপ দিতে চান।’’[৮৪]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় দেশবিভাগ জনিত বিষাদবোধ পরিলক্ষিত হয়— দেশভাগের যন্ত্রণাসহ যে স্বাধীনতা লাভ, জীবনে ঘনিয়ে আসা সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বাস্তুভিটে খুঁইয়ে বা বাস্তুহারা হয়ে নতুন বাস্তুভিটে খোঁজার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, খাদ্য-বস্ত্রের চরম সংকট জনিত বেদনাবোধ।

> ‘‘যা কিছু আমার চারপাশে ছিল

ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিমমুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্না
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসে-থাকা পথভিখারি

যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।"[৮৫]

—সত্যিই কি ভোলা যায় ভিটেমাটির গন্ধ, শিকড়স্থান! অথচ ভাঙন সত্যি, ছেড়ে আসা সত্যি— এই 'সত্যি'টাকে কবি হৃদয়-মন-মনন দিয়ে অনুভব করেছেন, তাই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অনিবার্যভাবে স্থান নিয়েছে সৃষ্টিজুড়ে।

"১৯৪৭ ও তার পরেকার পর্যায়ে ফেরা যাক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন। একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছু করেন নি যতটা করেছেন উত্তর ভারতে। এখানে কিন্তু একটা দুটো কথা বলা দরকার। দেশবিভাগের সময় লেখক দিল্লীতে ছিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক আদিবাস ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।"[৮৬]

কবি লেখেন—

"এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ
চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি,
একা
সবাই সব বুঝতে পারে কোন্ শেয়ালের কোথায় পথ পতনমুখে কীভাবে কে
হামলে দেয় গা
নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল আমার তাই এখানে চুপ করে
দাঁড়াই
সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না
তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না
চতুর্দশীর অন্ধকার তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি
একা
এইখানে চুপ করে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ"[৮৭]

কবির কবিতায় বারবার এসে উপস্থিত হয়েছে মঠ, সুপুরিবনের সারি আর ঠাকুরদা— যে ঠাকুরদা সারারাত জেগে থাকতেন, রাতপ্রহরীর প্রহরা চলাকালীনও!

"প্রহরী-নজর ছেড়ে এভাবে অবাধ যাওয়া-আসা—

এ-যাওয়া-আসার কোনো আদি নেই, নেই কোনো শেষও
হয়তো জানো না— তাই লিখে রাখি কীভাবে আমাকে
না-থাকার কণা দিয়ে আরো বেশি জড়িয়ে রেখেছ।"[৮৮]

তাঁর কাছে দেশভাগের যন্ত্রণা কেবলমাত্র দেশভাগের যন্ত্রণা নয়, হয়ে উঠেছে আত্মভাগের যন্ত্রণা, তিনি যেন পরবাসী— নিজের ভেতরে এবং দেশের মধ্যে, 'চিরকালই শুধু আশ্রয় ভিখারি'! তাঁর কবিতা আজও সেই বিষাদ থেকে মুক্ত নয়, তাই কেবলই যুক্ত হতে চায় ব্যক্তি-সমাজ-দেশ-বিশ্বজগতের সঙ্গে। যন্ত্রণাজড়িত উচ্চারণ—

"আমাদের আর তর সয় না
পঞ্চাশ বছর পরের সেই একাকার দেহচ্ছবি দেখবার জন্য
অন্তত দ্বিরাকার
যাতে দুজন দুজনকে জড়িয়ে নিতে পারি
অণুপরমাণু চঞ্চল
জলেরও কোনো ভাগবাঁটোয়ারা নেই
কতদিন, কতদিন আর মানুষ এ-রকম থাকতে পারে—
আঃহা, বলতে তো ভুলেই গেছি পঞ্চাশ বছর আগে আমরা কী ভেবেছিলাম!"[৮৯]

তাঁর 'জলস্পর্শ', 'পানপাতা', 'অজ্ঞাতবাস', 'সীমান্ত', 'মেঘনা', 'ভ্রমণ', 'সূর্যোদয়', 'স্বভূমি', 'যাত্রা', 'দেশ', বিষাদজন্মভূমি', 'বিদায়', 'নদীরেখা', 'দেশান্তর', 'মাটি', 'মঠ', 'দেশহীন'— "শবের উপরে শামিয়ানা" কাব্যগ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়গুচ্ছে কবিতা দেশভাগের যন্ত্রণা-ভালোবাসার কথায় চিত্রিত। নিঃসংশয়ে স্বীকার্য, তাঁর 'বাস্তু', 'ভিড়', 'কলকাতা' 'আত্মঘাত', 'ক্ষত' কবিতা সমূহের নেপথ্যেও কারু-আকারে রয়েছে পদ্মাপার থেকে আসার স্মৃতি-যন্ত্রণা। তাঁর স্বীকারোক্তি—

"মনে পড়ে আমাদের পুব-বাংলার ছোট্ট শহরের কথা, মনে হতে থাকে বড়ো এই শহরের মধ্যে আজও আমি চিনতে পারিনি কিছু। অন্য সকলেই কি সবকিছু জানে? ফিরে আসে আবার সেই ড্রাইভারের মুখ, সেই চোখ, আর সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আসে অদ্ভুত কটা লাইন, যেন আমি বলছি কাকে : 'বাপজান হে/ কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে/আমিই কিছু জানি না'। বাপজান কে হঠাৎ? অল্প একটু হাসি এসে পৌঁছয় ঠোঁটের কোণে। একটু অপেক্ষা করে থাকি, মনের মধ্যে কেবলই ঘুরতে থাকে শব্দকটা। আর, কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে আসে ছোটো এক কবিতা, দিনের বেলার ওই ঘটনার সঙ্গে সামান্যই তার যোগ।"[৯০]

বিবর্তনের ধারায় মানুষের জীবন-দল-যৌথসমাজ-গোষ্ঠীসমাজ গড়ন-গঠন-যাপন-চিন্তন-

মনন-বাস বিবর্তিত হতে-হতে এসে পৌঁছেছে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরিকল্পিত নাগরিক অবস্থায়।

"A city like London, where one can roam about for hours without reaching the begining of an end, without seeing the slightest indication that open country is nearby, is really something very special ... Hundreds of thousands of people of all class and ranks of society jostle past one another ... And yet they rush past one another as if they had nothing in common or were in no way associated with one another ... The greater the number of people that are packed in a tiny space, the more repulsive and offensive becomes the brutal indifference, the unfeeling concerntration of each person on his private affairs.' যান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ফল হিশেবে গড়ে উঠেছে যেমন মহাকায় নগর, তেমনি বিশাল হয়ে উঠেছে সংগঠনগুলি— বিশাল-বিশাল প্রতিষ্ঠানে— কারখানায় মানুষ কাজ করে, মহাকায় বহুতল বাড়ির কন্দরে-কন্দরে মানুষ বাস করে, লক্ষ লোক স্টেডিয়ামে একত্রে প্রমোদের সময় কাটায়— মানুষের সমিতিগুলিও প্রকাণ্ড। এই সব বিশালতা মানুষের মনে জাগায় নিরর্থকতা, তুচ্ছতার বোধ।"[৯১]

রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় নগরের বন্দনা থাকলেও তাতে যন্ত্রযুগলালিত নগরের ফেনিলতাসমগ্র নেই; এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেও। পল্লী বিচ্যুত নগর-নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ে; ভাঙনে; স্বার্থের সংঘাতে, বিলাসিতার লক্ষ্যে; বৈশ্য আদর্শের আধিপত্যে। অনাচার-অত্যাচার, ভাঁড়ামি-বোকামি-নিষ্ঠুরতায়; কামনা-বাসনার স্খলন-অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা; নগরের-মৃত্যু-বন্ধ্যাত্ব-মূল্যবোধহীনতা অথবা অপার লীলায় পরিপূর্ণ জীবন প্রথম উঠে এল বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতায়।

বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় শহর-নাগরকেন্দ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর কাছে শহর একই সঙ্গে রূপায়ণ ও ধ্বংসের; খণ্ডের ও পরিপূর্ণের—বাঁচার। তাঁর কবিতায়— 'আমেরিকা জ্বলে ওঠে, বৃষ্টি পড়ে— ট্রামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে'! আলোচ্য যে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় যে শহর-নগরের ছবি পাওয়া যায় তাতে লেগে আছে মুগ্ধতার সুর-রহস্য; বাসনা চরিতার্থতার অর্থাৎ 'সব পেয়েছির দেশ'-এর বিচিত্রতার স্পন্দন। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নগর-চেতনা অত্যন্ত গভীরতর রূপ পেয়েছে—

"নগরীর মহ�ৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব— অতিবৈতনিক,

বস্তুত কাপড় পড়ে লজ্জাবশত।"[৯২]

তার আগে— হাইড্র্যান্ট-কুষ্ঠরোগী, একটি মোটরের 'গাড়লের মতো' কেশে চলে যাওয়া; ইহুদী রমণীর 'আধো জেগে' থেকে গান সব কিছু যেমন অদ্ভুত আর তেমনি বাকিটা যেন 'লজ্জাবশত'। অথচ এই কবিই একদিন লিখেছিলেন— 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' এবং 'ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে' 'ক্রমমুক্তি' হবে বলে যেন সমস্ত আলো নিভে গেছে—

"এই নগরী যে-কোনো দেশ; যে-কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্রাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডেকে।"[৯৩]

তবুও আশা এইমাত্র যে, 'ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।'

বিষ্ণু দে ঐতিহ্যে, সমবায়ে, জনসমুদ্রে আপামর বিশ্বাসী কবি হয়েও শহরের বিবর্ণ জীবন জটিল জীবনযাত্রার রুদ্ধশ্বাস ছবি আঁকতে গিয়ে প্রশ্নে আটকে থাকেন—

"চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?"[৯৪]

যদিবা প্রশ্নবোধককে আশায়-বিশ্বাসে 'হ্যাঁ'-এর পিঠে নিয়ে আসেন— তবুও 'সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি'কে এড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং নগর নাগরিক মানুষের মূল্যবোধহীন বা ফাঁপা মূল্যবোধ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লিখলেন— 'সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে'!

"হঠাৎ উঠেছে দেখো ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হতে পারে কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাশা,
জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরানোসরাস
আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল
পেতেছে দপ্তর গদি গোমস্তা ফরাস খাসা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী
কলকাতার কপালের গেরো।"[৯৫]

এই নগরে-নরকে 'বর' যে 'সত্তা' খুঁজে বেড়াবে তা যেমন স্বাভাবিক তেমনি অস্বাভাবিক নয় 'আত্মপরিচয়' খুঁজে না পাওয়া।

সমর সেন আপাদমস্তক কলকাতার কবি— অতএব স্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী যন্ত্র সভ্যতার

চাপে পরিস্ফুট নগরজীবনের যে অবক্ষয়ী চেহারা; অনাচার-অত্যাচার; যৌবন-কামনা-বাসনার বিকৃতি ও অবমাননা; প্রাণহীন যান্ত্রিক সম্ভোগ— পুনরায় সম্ভোগের ক্লান্তি; ধূর্ততা-শঠতা— বিপর্যস্ত মূল্যবোধ; চরমতম শৈথিল্য, অসুস্থ মনোবিকার; চেতনার স্খলন-অস্থিরতা এবং ক্রমবর্ধমান জীবন-বিতৃষ্ণা মনোভাবসহ আরও যে-সব লক্ষণ অবক্ষয় নিয়ে এসেছিল তারই বর্ণ-প্রকাশক। তাঁর কবিতার রক্তে যেন 'কলকাতার ক্লান্ত কোলাহল', 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'। অথবা— 'দিকে দিকে আজ হানা' দেয় বর্বর নগর— 'কত শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি'!

''আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।''[৯৬]

—নগর ও নগরকেন্দ্রিক জীবন-যাপন-প্রেম এবং তৎসম্বন্ধীয় ছলা-কলা-কৌশল; ক্ষয়-ক্ষত-অবক্ষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে, তবে বিদ্রুপের শর নিজের দিকেই— নিজের মধ্যবিত্ত নাগরিক অস্তিত্ব, জোড়াতালি-আপস; অন্তঃসারশূন্য বাহারি মুখোশের সুচারু ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। লিখে রাখেন—

''মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিনভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আছে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।''[৯৭]

সমর সেন বরাবরই কাল-সমান্তর। তাই কেবল নাগরিক জীবনমনস্কতাই নয়, রাজনীতি ও সমকাল-সচেতনতা এবং পরোক্ষ রাজনীতি চর্চা অর্থাৎ 'মধ্যবিত্ত' ও মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা বিষয়ে সচেতন। সুতরাং, যারপরনাই সচেতনভাবে প্রকাশ করেছেন সেই নির্মমচেতনাকে— অশান্ত, যন্ত্রণাময় যৌবনের দিনগুলি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার শাণিত থাবা, বণিক সভ্যতার শাসনশোষণ-অবক্ষয়— পুঁজিবাদী যন্ত্র-সভ্যতার অবক্ষয়ী নগর জীবনের ছবি, অসুস্থ মনোবিকার, যান্ত্রিক জীবন-সম্ভোগের অপরিসীম ক্লান্তি-স্খলন, ধূসর-মরুময়— সমস্ত কিছুই পণ্য; কামনার তীব্র দহন আছে কিন্তু দাহ নেই— সম্পর্ক বাণিজ্যিক মাত্র! স্বাভাবিকভাবে সমর সেনের কবিতা জুড়ে যে নাগরিক

জীবন-যাপন পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে, বিকারগ্রস্ত যৌনতা, বিকৃত প্রেম; বেহায়া কামনা-বাসনার স্থূল প্রকাশ— 'লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়', 'মাতালের স্খলিত চিৎকার', 'ক্লান্ত গণিকার কোলাহল'। আবার—

''কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্র কন্যা, অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!
অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।''[৯৮]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা বহুস্তরের— প্রেম-প্রতিবাদের, শূন্যতা-নীরবতার, জীবনের ভাঙন-গড়নের, ধ্বংসের এবং প্রার্থনার, সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার, ব্যথাময় অথচ নিরাময়েরও। মানুষের প্রতিদিনের যাপন-শাসন-শোষণ-আত্মঅপমান-হঠকারিতা-আত্মঅহংকার-আত্মবিনয়-প্রেম-ভালোবাসা বারবার ধ্বনিত। এই ধ্বনিতে নাগরিক জীবনকথাও উচ্চারিত।

কবির কবিতা আত্ম এবং আত্মবিস্তারের— আর তাতে যে বিভ্রম-ব্যর্থতা— হীনমন্যতা আছে তা উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ এবং সমস্ত রকম ব্যর্থতা-গ্লানি-শঠতা-মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে করুণায় প্রতিবাদ। তাঁর কবিতা চিৎকারের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র শব্দ-বাক্য লাইন অথবা চিৎকার নয়; তাতে জড়িয়ে আছে শব্দের সংযম এবং প্রতিবাদের সঙ্গে নীরবতা, ভালোবাসার মায়া।

''আসলে, যাকে বাইরে দেখি প্রহার বা ক্রোধ, তারই অন্য পিঠে আছে গহন কান্না। এ ছাড়া কোনো বড়ো শিল্প নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যে কোথায় আছে তার অস্তিত্ব? এই যে পিঁপড়ের মতো ব্যস্ততা চলছে সমস্ত সংসার জুড়ে, নিয়মে হিসেবে বাঁধা, নির্বোধ ব্যক্তিগত উচ্চাশার হানাহানি, মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়িয়ে যদি কেউ সেই অবোধ চলার উল্টো দিকে তাকান, তার সঙ্গে তৈরি করেন একটা সম্পর্ক, অমনি দেখা যায় অন্তরালবর্তী এক রোদসীরেখা। জেগে ওঠে আরেকটা ঊর্মিময় দেশ। এই দেখাই, চলতি জীবনের আত্মার সঙ্গে এই গোপন সম্পর্কই কবিতা, এইখানে ধরা দিতে থাকে ভয়াবহ এক পরিণামহীন মীমাংসাহীন সত্য। আর এই সত্যকেই, এই সম্পর্ককেই আবিষ্কার করে নিতে চায় নীরবতা, শব্দমধ্যবর্তী নিঃশব্দ।''[৯৯]

কবির কবিতায় নগরের ছবি যেমন দুঃখের সঙ্গে উঠে আসে তেমনি তাতে বিদ্যমান শ্লেষ-প্রশ্নবোধক এবং সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জগৎ-জীবন পরিধির অভিঘাত। যেখানে মধ্যবিত্ত মানুষের মূল্যবোধ ক্ষয়ে-ক্ষয়ে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে; যেখানে মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মসমালোচনা নেই বললেই চলে; নেই কথা ও কর্মের মধ্যে সমতা। বিবর্তিত ব্যক্তিসত্তা—

ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরে পরিবার, সমাজ। সামাজিক নিয়মের পথ ধরে 'প্রেয়'কে জয় করেছে 'শ্রেয়' অর্থাৎ জয় হয়েছে মানবিক মূল্যবোধের। মূল্যবোধ অর্থাৎ 'Sense of values' ল্যাটিন শব্দ 'Valere' থেকে আসা 'Value' কথাটির অর্থ— to be strong, to be worthly. মূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের জীবন-যাপন-চেতনা, নির্ভর। এই মূল্যবোধ সমাজ বা রাষ্ট্র, চিন্তা-চেতনা, নৈতিক ভালো-মন্দ বিচার শেষে ভাষা-কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই মূল্যবোধেরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে সভ্যতার সঙ্কট, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতা, অনাস্থার পথ বেয়ে বিপন্নতা-অবক্ষয়। নেপথ্যের কারণ— পরপর দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে জীবন-মন-যাপন বিষয়ক নানা তথ্য-তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এইসবের সঙ্গে আছে বদলে যাওয়া সমাজ-অর্থনীতির প্রভাব। অতীতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা-অধিকারের দাবীকে সামনে রেখে যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি-পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার পরিপক্ক রূপ প্রকাশ বহুজাতিক কর্পোরেশনের উদ্যোগে গঠিত আধুনিক পুঁজিবাদে।

> ''আধুনিক পুঁজিবাদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লগ্নির যে বিপুল প্রসার ঘটেছে তার মূলে আছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি, সুনির্দিষ্ট কৌশল, দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পদ, তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন অধ্যায়ে প্রাধান্যকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিপর্যয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সংকট, অনুন্নত ও সদ্যস্বাধীন দেশের শিল্পায়ন, প্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের প্রয়োজন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগে, জাতীয় পুঁজির স্বল্পতা, এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব বহুজাতিক সংস্থাগুলির সামনে বিশ্বব্যাপী বাজারের দরজা মুক্ত করে দিয়েছে।''[১০০]

—এই অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা এবং গড়ে ওঠা নাগরিকতা যে কতটা শরাঘাত তা কবির ''কবিতার মুহূর্ত'' বইয়ের দু-চার লাইন তুলে দিলে সহজবোধ্য হয়—

> ''বেলগাছিয়ায়, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছি এক বিকেলবেলায় মেয়ের হাত ধরে। সাড়ে তিন বছর বয়স তার, পরনে তার শখের একটা লাল নিকারবোকার, হাঁটতে হাঁটতে বলছে কেবলই : 'একটা গল্প বলো।'...
>
> মেয়েকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্য বলি, 'গল্প? আগে তুমি বলো একটা, তারপর আমি' 'আমি বলব?' একটু এদিক-ওদিক তাকায় সে। তারপর হঠাৎ শুরু করে : 'আজকাল—' 'হ্যাঁ, আজকাল— তারপর? 'আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না।' 'বনে' শব্দটার উপর একটু চাপ দিয়ে বলল সে এই লাইন। 'থাকে না? কোথায় থাকে?' 'কলকাতায় থাকে।'
>
> কথাটা শপাং করে লাগল আমার মাথায়। হয়তো 'আজকাল' শব্দটাই এই

কাণ্ড করল। মেয়ে গল্প বলতে থাকে তার আপন মনে, কিন্তু আমি কেবল দু-একটা অস্ফুট সায় দিয়ে সরিয়ে রাখি মন। কলকাতার জঙ্গল ভেসে ওঠে চোখে। কদিন আগে খবর শুনেছি এক বাস্তুহারা পরিবারের মেয়েকে নিয়ে গেছে কারা, আর্ত হয়ে তাকে খুঁজে বড়াচ্ছে তার মা, তার প্রেমিক। কিন্তু পুলিশ বলে : কতই তো হচ্ছে ওরকম। দেখুন, হয়তো নিজেই পালিয়েছে!

গল্প বলতে থাকে মেয়ে, আমি কেবল তার হাত আরো শক্ত করে ধরি, একলাইনও শুনি না আর, শুধু বলি; 'তারপর?' আর মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে শুধু : কলকাতায় থাকে, আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, কলকাতায় থাকে!''[১০১]

—'আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, কলকাতায় থাকে!' এই বিস্ময়বোধক বাক্য প্রথমত কলকাতা নামক নগরে বসবাসকারী মনুষের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে এবং তার জীবন-অবস্থান চিহ্নিত করে। উচ্চারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে—

''আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না
কলকাতায় থাকে।
আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল
জবার পোশাকে।
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

শুধু ওই যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনও প্রতীক্ষা করে তাকে!

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?''[১০১]

—নাগরিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মানুষেরা মানুষের অপমান নিজের চোখেই দেখে এবং করে— অথচ নিজের দিকে কোন তর্জনী থাকে না; থাকে না আত্মসমালোচনা! বিচার নেই, 'আরো শত নিষ্ঠুরতা বাকি,' 'মিথ্যাচারী মিথ্যাভাষী, শঠ আমিই মহান, দেখ আমাকে'— এখানেই 'কার ছির ছেঁড়ে সুদর্শন?' বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

''ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?

'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—"[১০৩]

কবিতাটির 'সূচনাকথা'—

> "সেও অনেকদিন আগের কথা। বাস থেকে নেমে আসবার চেষ্টা করছি, আর সে-চেষ্টাটার ধরণ যে কী হতে পারে, কলকাতার মানুষ তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। নামবার অল্প আগে থেকে, প্রায় অল্প বয়সের মতোই, বুকের মধ্যে ছোটো একটা কাঁপুনি শুরু হতে থাকে অনিশ্চয়তার ভয়, অন্যদের বিব্রত করবার ভয়। তবু, নামতে তো হবেই, এসে গেছে স্টপ। একটু কি দেরি হয়ে গেল? দ্রুততার চেষ্টায় রেগে উঠলেন দু-চারজন। 'নামবেন তো আগে মনে থাকে না?' 'অতো ঠেলছেন কেন মশাই?' 'দেখতে পাচ্ছেন না দাঁড়িয়ে আছি? একটু সরু হয়ে যান না, একটু ছোটো হয়ে যান?'
>
> যথেষ্ট সরুই ছিলাম অবশ্য, তবুও লজ্জিত হতে হলো কথাটি শুনে। অনেকটা কি জায়গা জুড়ে আছি তবে? ক্রুদ্ধ সেই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ওঠেন অনেকে, না-হাসতে পাড়লে তো কালকাতার লোক পাগলই হয়ে যেত!..."[১০৪]

'আমরা সবাই খুব পরিমিত স্বাভাবিক কথা বলি'— যেন কিছুই হয়নি! যেন মানুষের জঙ্গল-কোলাহল-দূষণ-ধাপ্পা-ঠকের নগরে যা হচ্ছে সবই স্বাভাবিক— 'হাত খুলে যায় পাপের অভ্যাসে'! এখানে ভালোবাসা ছাড়া ঈর্ষা-ঘৃণাই বেশি। এই নাগরিক যাপনে জীবনের চারপাশে কখন যেন 'চতুর্দিকে শহর', 'চতুর্দিকে আলো'-এর মিথ্যে ঘিরে ধরেছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসকে রুদ্ধ করে সরলভাবে বেঁচে থাকাকে করেছে গ্লানিময়। 'এই মুখ ঠিক মুখ নয়' 'মিথ্যে লেগে আছে'। উচ্চারিত হয় 'কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?' সমালোচনার সঙ্গে আত্মসমালোচনা।

> "অতিকায় সঙের শহর কলকাতা, ভিখিরিতে ছেয়ে গেছে দেশ। তাহলে কি শহরের কবিতা মৃত্যুর কবিতা, একমাত্র গ্রামময় নিসর্গ-প্রান্তরের কবিতাই কি জীবনের কবিতা? আপাতত এমন মনে হলেও সেটা ঠিক নয়। এই কবি জানেন, বর্তমান অপমানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মালিণ্যমুগ্ধ স্মৃতিময় অতীত, শহুরে পাথরের গায়ে জলজ গুল্ম, সবুজে সবুজ হয়ে থাকা পৃথিবী, তেমনি বর্তমানের ভিতর থেকে স্ফুরিত হয় ভবিষ্যৎ।"[১০৫]

'এ কলকাতামাছে আছে আরেকটা কলকাতা' উচ্চারিত হয়। এখানে 'দিনকে যে রাত করা কিছুই কঠিন নয় বুঝে' নিমেষেই চোখের সামনে চুরি হয়ে যায় পুকুর! এইসব পাথর যখন বুকে চেপে বসেছে তখন নামানো প্রায় অসম্ভাব্য হয়ে উঠেছে অথচ সমাজচেতন— আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত মানুষ 'দাঁড়াবার মতো' বরে বাঁচতে চায়; আত্মসম্মান না খুইয়ে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে চায়। কিন্তু এখানে সরল মানুষের মতো বাঁচা সহজ নয় নগর কিছু রেয়াত দেয় না অথবা বলা ভাল নগর

কোন 'লজ্জা' রাখে না যা কিনা 'লজ্জা' নিবারণ করতে সাহায্য করবে। লোভ-লালসার দাঁত এত বেশি বড় যে, বিবর্তিত মানুষ আদিম অবস্থাকেও লজ্জায় ফেলে দেয়! একে অন্যকে এমনভাবে তাকায় যেন কেউই অপরাধী নয়; এবং সেইসব মানুষের ভিড়ে যদি নতুন কোন সরল— চাতুরীহীন মানুষ গিয়ে পৌঁছোয় তবে মানুষ যে মানুষকে কতোটা অপমান করতে পারে তা ভয়ের প্রকাশ ঘটায়—

> ''বাপজান হে
> কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
> আমিই কিছু জানি না
>
> আমারে কেউ পুছত না
> কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
> নিজে তো কেউ দুষ্ট না
> ...
> অ সোনাবৌ আমিনা
> আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
> কইলকাত্তায় যামু না।''[১০৬]

তবে কি মানুষ-জন 'বেঁচে' নেই কলকাতা-নগরে অথবা নগরে? 'খুব ভালোবেঁচে' আছে। রাজনীতি-প্রেম-প্রতিদিনের বাজার— রান্নাবাটি 'ছদ্মের সংসারে কানামাছি' সহ সমস্ত রকমের ছোঁয়াছুয়ি এবং প্রয়োজনে মুখোশ বদলানো। এখানকার বাঁচন-বিষয়ক আবহাওয়া এমন— প্রতিবাদ যে হয় না তেমন নয়; বরং বেশিই হয়। কিন্তু যেখানে শব্দ নৈঃশব্দ তৈরি করতে পারে না সেখানে কী মূল্য সেইসব কলরব-চিৎকারের?

> ''শহরকেন্দ্রিক এই সভ্যতায় ভাবুক মানুষেরা সবাই প্রায় জড়ো হন গোলমেলে এক মেট্রোপলিসে, কিন্তু তাঁদের ভাবনার সঙ্গে কেবলই সংঘাত হতে থাকে বাইরের পরিবেশের।... মেট্রোপলিস মাত্রেই আজ হৃদয়বর্জিত এক টাকার থলি হয়ে ওঠে, সেখান থেকে ছুটে যায় হৃদয়, জেগে ওঠে শুকনো এক করোটি মাত্র। সেই করোটি যেন শুনতে পায় : বাইরের জগতে প্রচণ্ড এক শব্দতরঙ্গ উঠছে নামছে, বধির হয়ে আসে আমাদের সমস্ত চেতনা, ট্রাম-বাস-লরির কর্কশ ঝংকার, বেঁচে থাকার দুঃসহ প্রতিযোগিতায় ধাবমান চিৎকার, হিসেবি এক বুঝে-পড়ে-নেওয়ার স্বার্থসংসারে সবাই সবাইকে ঠেলছে আর তার থেকে ক্রমশ বেজে উঠছে একটা টাকাপয়সা লেনদেনের ঝন্‌ঝন্‌—।''[১০৭]

কিন্তু পালাবার পথ কোথায়? আড়াল? বদলে যাওয়া দিন-যাপনে মানুষের হাতের আঙুলের নখ হয়ে উঠেছে ধারালো বাঘনখ; দুই চোখে জমে উঠেছে লালসার লালা আর হৃৎপিণ্ড— পাথর সমান! মুখে অনর্থক কথার খই ফুটলেও মেরুদণ্ড সরীসৃপের আভাময়। সারা শহর জুড়ে যেন নপুংসকের মিছিল!

"মানুষের চারধারে মানুষ
হেঁটে চলে যায়
মানুষের চারধারে মানুষ
হামাগুড়ি দেয়
দেখাশোনা হতে থাকে, লাভ লোকসান
ক্ষয়ক্ষতি..."[১০৮]

এই মহানাগরিক মিছিলের বাইরে আছে গ্রাম— প্রেম-সৌন্দর্য-সবুজ আভাময় সরল মানুষের ঘর। কত লোক আছে যারা ঘুঘু দেখেনি, ফাঁদও নয়!'— এই সব জানেন না শহরের মানুষেরা। কবি উচ্চারণ করেন—

"আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো তুমি।"[১০৯]

তিনি বিশ্বাসী এবং প্রার্থনারত— অথচ নগর জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে নগর জীবনের চতুরতা, ভণ্ডামি, ছল-ছলনা-কলা-কৌশল-লাস্য-হাস্য-বিলাসিতা; মূল্যবোধহীন দম্ভ-হাস্যরোল; মারামারি-খুনোখুনি; 'কলুষ মাখানো হাত'। এই অবস্থায় উচ্চারণ করেন— 'মিথ্যা শেষ হয়ে যাক, শেষ হোক আলোর চাতুরী'। লিখতে চান 'আয়ু'— আদরের সম্পূর্ণ মর্মর' কথা। নাগরিক জীবনের ছল-চাতুরী কবিকে ক্লান্ত করেছে তবে এই ক্লান্তির মাঝেও 'সমূহ প্রবাহ' পাবেন বলে দু-চোখ ভিজিয়ে নেন 'অন্ধকারে'— সেই আলোময় অন্ধকারে।

"আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব বলে
এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।"[১১০]

তাঁর কবিতায় মানুষেরই কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন মানুষ, কিন্তু 'নাগরিক বাস্তবতা' আয়ত্বে আনতে না পারা মানুষসকল বুঝতে পারেনি 'সত্য' ভাঙনের কারণ! তাই দেখেছে নিজেরই অপমান— অথচ কোন 'ফনফেশন' বা আত্মস্বীকারোক্তি নেই! বধির-পাণ্ডুর নাগরিক জীবনে বিশ্বাস-সজলতা-

সরলতার কোন মূল্য নেই; এখানকার ভাষা-গান-হাসি বোধগম্য হওয়ার আগেই জীবন চলে যায় অন্ধকারে। এই আবহে গ্রামের অশ্বত্থও পথ হারায়; প্রস্তুত হয় সব ফেলে রেখে চলে যাবার জন্য। তবে সব ফেলে রেখে যাবার আগে যে বিশ্বাস বেঁচে আছে অথবা আলো— তাতে রেখে যায় প্রশ্ন—

> ‘‘এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ?
> এ কোন্ জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে?
> এ তো আমাদের কোন যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
> সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাব পুড়ে।’’[১১১]

সাধারণ শহর নয়, বিদ্যানিকেতনেও নাগরিক-কলা-ছলার সর্বোচ্চ প্রকাশ। সেখানেও বিজ্ঞাপন-হোডিং-ব্যানার-ফেস্টুন এবং মিথ্যে আলোর চাতুরী! ভেদাভেদ— গ্রাম ও শহরের!

> ‘‘বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক ধারা বিশ্বব্যাপী বহমান। অতি দ্রুত তা প্রসার লাভ করেছে তথ্য-প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, বহুজাতিক কোম্পানি, উদার অর্থনীতি, মুক্তবাজার, বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন, ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং ও বীমা, ই-গভর্ননেন্স, ই-কমার্স ও ই-লার্নিং-এর সহায়তায়। বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার বিশ্বায়নের গতিধারাকে অবাধ ও তীব্রতর করেছে। পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নয়নশীল দেশসমূহ নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নয়নশীল দেশসমূহ নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এনেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। উন্নত রাষ্ট্রগুলো বিশ্বায়নের কুফল মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যাস্ফীত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক ও নারী বিশ্বায়নের অসহায় শিকার হচ্ছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর বৃহৎ পর্যায়ের পুঁজি, বিজ্ঞাননির্ভর উন্নত ব্যবস্থা, বাজারের আধিপত্য ও বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্মের নিকট অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্নপ্রায়। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্থ-রাজনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যথাযথ চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অব্যাহত প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের অনিবার্যতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।’’[১১২]

—দাঁড়িয়ে থাকা যেমন ‘গলির কোণে’ তেমনি চোখের সামনে শুধুমাত্র ‘নিওন আলো’— ‘বিজ্ঞাপন’ আর ‘রংবাহার’—

> ‘‘একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি

তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।"[১১৩]

ঢেকে যাওয়া মুখে কোন রকমের সরলতা থাকে না, থাকে শুধু 'কথার ভেতরে কথা' খোঁজা। এখানে এসে কবির কবিতা যেন বিবর্তিত নাগরিকতার চরমতম বিন্দু স্পর্শ করে। যে মানুষ অনেকদিন আগেই 'একলা' হয়ে গেছে— তবুও বাকি ছিল কিছু অপেক্ষা, বৃষ্টিপতনের শব্দ। অথচ সময়ের ধারায়— 'মুখ' বিজ্ঞাপনে ঢেকে গিয়ে কখন যেন 'মুখোশ' হয়ে গিয়েছে অথবা নিজেই 'বিজ্ঞাপন'— আর তা নিজেরই! কবির এখানেই স্বকীয়তা এবং নাগরিক জীবনাঙ্কনের পারদর্শিতা। তবে এইসব উচ্চারণের সঙ্গে কবির লড়াই-বোধ, প্রতিবাদ-মানসিকতা এবং ভালোবাসার কথাই তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। আলোচিত যে, তাঁর কবিতা বহুস্তরীভূত— সেই বহুস্তরের একটি তলে নাগরিক জীবনের ছলা-কলা-কৌশল-চাতুরীর কথা থাকলেও গহন কান্নাস্থান বহুতলে বিস্তৃত। তিনি লেখেন, বড় ব্যথাময়—

"আমার শহরে আজও সুশোভন সরকার গোপীনাথ ভট্টাচার্য শশিভূষণেরা
জ্ঞানভাণ্ড হাতে নিয়ে সাবলীল হেঁটে যান নালন্দার দিকে
শতেক ঝলকলাগা শপিং মলের পাশে দেখি আমি তারই ছত্রছায়ে
প্রতি নতুনের মধ্যে শিরায় শিরায় ধমনিতে
আমার শহরে আজও অনাহত চিরায়ত পুরোনো কলকাতা বয়ে যায়।"[১১৪]

একজন সমালোচক লেখেন—

"বাস্তব তো সেই আধাজীবনের, যেখানে বিজ্ঞাপনে আড়াল হয়ে যায় মুখ, যেখানে যা-কিছু ব্যক্তিগত সবই নিয়ন আলোয় পণ্য হয়ে যায়। বাস্তব যে এমনই না-মূলক, এমনই বিচ্ছেদময়, সে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, তাকে মেনে-নেওয়া নয়, তার সঙ্গে সচেতন লড়াই থাকা চাই। সে লড়াই স্বপ্ন দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। 'ভালোবাসা' শব্দটি এই কবির কবিতায় নানাভাবে আমরা পেয়েছি আগে। মনে পড়ছে 'আমাদের ভালোবাসা' নামে কবিতায় নানাভাবে আমরা পেয়েছি আছে। মনে পড়ছে 'আমাদের ভালোবাসা' নামে কবিতার একটি পঙ্ক্তি, 'যদি বলো ব্যক্তিগত তবে তাই, এরই তো বীজের মধ্যে দশ দিক ঘুরে আসা।"[১১৫]

কবির প্রেম-সমাজবোধ ও সমাজ-দেশ-কাল-ইতিহাসচেতনা। অন্তর্লীন প্রেরণার মতো কবিহৃদয়ে আসীন। অতএব, আধুনিকতার অনেকান্তিক শর্তে কবির সৃষ্টি জুড়ে ভালোবাসার নিবিড় ফল-ফলাফলের সঙ্গে সমাজ-দেশ-কালের কার্য-কারণ মগ্নতা-বিপন্নতা আলো-অন্ধকার অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকে। শঙ্খ ঘোষ ব্যতিক্রম নন, বরং গভীরভাবে সমাজ-দেশ-কাল-

ইতিহাস ভালোবাসার প্রকাশক তিনি। তাঁর কবিতায় সমাজ-দেশ-কালের সর্বজনীন সংকটের সঙ্গে আত্মসংকট অনন্যভাবে জড়িয়ে আছে— "দিনগুলি রাতগুলি" (১৯৫৬) থেকে সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত।

সামাজিক ব্যক্তি সংকটের মধ্যেই জন্ম হয় সামাজিক দূরত্বের বোধ, শূন্যতাবোধ, ব্যক্তির আত্ম-বিচ্ছেদের মর্মযন্ত্রণার। স্মরণীয় যে, যে কবি যতবেশি আলোর প্রত্যাশী সেই কবি ততবেশি ক্ষতবিক্ষত। কবি জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে সেই বোধ তাকে 'সহজ লোকের মতো' চলতে দেয়নি—

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?"[১১৬]

কারণ, চতুর্দিকে যেখানে মানুষ-মানবতার অপমান; জীর্ণতা-জরা-ক্ষয়-মৃত্যুর চিহ্ন; প্রাণে-শক্তিতে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কোথাও কোন ঐশ্বর্যময় আলো নেই, যেখানে সব পুরনো-বাসি-মেকি— কুশ্রীতা ও অসম্পূর্ণতা। কবি —

"নষ্ট শসা— পচা চলকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।"[১১৭]

আবার—

"হে নর, হে নারী
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি।"[১১৮]

অথবা—

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরী নাই,— রূপ ঝ'রে পড়ে তার,
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে,"[১১৯]

যুগের মূল্যবোধহীনতা কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সমস্ত অন্ধকার ইতিহাসচেতনার

সঙ্গে মিশিয়ে ভবিষ্যৎমুখী-আলোকমুখী করে অঙ্কন করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে ধ্রুপদী শিল্পের গাঢ়তা, প্রতীকী কবিদের সুসংহত ব্যঞ্জনা এবং কথন, ইন্দ্রিয়ঘনতার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতা-অভিজ্ঞতা-অধ্যাবসায়— বিশ্ববীক্ষা-মননশীলতা ও আন্তরিক যুক্তি-বুদ্ধির পরিমিত প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর কবিতা বিপ্রতীপভাবে রয়েছে স্তেফান মালার্মে, ভালেরির প্রভাব অর্থাৎ মালার্মের নেতিবাদে বিশ্বাসী হয়েও শেষাবধি ভালেরির মতো ক্ষণবাদে উপনীত হন। আবার মালার্মের যুক্তিহীনতা, মিষ্টিক অনুভূতি ও সংগীতময়তার বিপরীতমুখে অবস্থান তাঁর। পরস্পর বিপরীতমুখি ও সমমুখী উপলব্ধির কথা অস্বীকার্য নয়। তিনি 'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা'র কবি। তাঁর 'তন্বী' (১৯৩০) ও ''অর্কেস্ট্রা''তে (১৯৩৫) মিলন বিরহের কথা সত্যনিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হলেও ''ক্রন্দসী'' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থ থেকেই ব্যক্তি-সমাজ-সময় বিষয়ক চেতনা প্রকাশ পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার অনতি দূরবর্তী সময়ের মানবসভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা-ক্ষয়-বেদনা-সর্বনাশ-আত্মসমালোচনাহীনতা প্রকাশ পায় তাঁর 'উটপাখি' নামক কবিতায়—

''আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।''[১২০]

কবি 'উটপাখি'কে 'তুমি' সম্বোধন করে 'আমি' এর মুখোমুখি ভসে 'আত্মপরিক্রমা'-এর সঙ্গে যুগপরিক্রমা করেছেন।

''ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কী নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।''[১২১]

এইসব 'প্রশ্নবোধক' উচ্চারণে 'বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা'র পথ পার হয়ে আত্মসমালোচনার মুখোমুখি হওয়া এবং উচ্চারিত হয় 'তুমি' ও 'আমি' মিলে 'আমরা-র কথা—

''আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু-জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের, পরে দেনা শোধরার ভার।''[১২২]

কবির ''উত্তরফাল্গুনী'' (১৯৪০)-এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ, ''সংবর্ত''-তে (১৯৫৩) দেশ-কাল-সময়-সমাজের সার্বিক ছবি উঠে এসেছে। কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ সাধারণভাবে ১৯৩৭-

এর পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামার প্রাক্-কাল থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত লিখিত। অতএব, ঘটমান বর্তমানের ঘটনাসমূহের প্রভাবের সঙ্গে অতীত-ভবিষ্যৎ-যুগাতীতচেতনার মেলবন্ধনে সমসাময়িক সমাজ-জীবন-যাপনের কথা অঙ্কিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থা থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্তের সঙ্গে ইউরোপের ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর মৃত্যু-মৃত্যু খেলায় আণবিক বোমার ব্যবহার, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন-কার্যাবলী-সাফল্য-ব্যর্থতা— সমস্ত কিছুই কবিমানসে প্রবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-র সৃষ্টি করেছিল। উচ্চারিত হয়েছে—

‘‘আসন্ন প্রলয় :
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্বস্ব ঘুচিয়ে, যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজও বাঁচে,
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর;
...
নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিতচৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহত্যা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।
কাঁলপেঁচা, বাদুর, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
আমাকে আবিল করে; একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাশা, নিরিন্দ্রিয় বৈদুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহে বাঁধে।’’[১২৩]

সমাজ কোন চিরপ্রতিষ্ঠান নয়— এমনকি ব্যক্তিও একটিমাত্র কালে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের গতি অতীত থেকে অনাগতের দিকে আর একজন কবির অঙ্কন অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার সম্ভ্যাব্যতার দিকে। কবির উচ্চারণে—

‘‘নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগ নায়ক। আমি পাতি
যৌবরাজ্য— ব্যোমযান, কামান পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়, ন্যায়, ক্ষমা, মিতালী, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ

...

হয়তো তখনই

উপলক্ষ সংবর্তের আড়ালে অশনি

লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।

প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল

তৎপূর্বে অন্তত

মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো;

এবং উদ্বাস্তু ট্রট্স্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে

ঘুরে মরেছিল, পুরকালীন শহরে

গলঘন্ট কুষ্ঠরোগী, যত দ্বার সব বন্ধ দেখে,

যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে।”[১২৪]

অথচ কবি দেখেছেন রাজনীতির কূট-কৌশলে বিধ্বস্ত মানুষের অসহায়তা; গণতন্ত্রের মুখ পড়ে একনায়কতন্ত্রের আস্ফালন— যা প্রায় ফ্যাসিবাদ ও ন্যাংসীবাদের সমপর্যায়ভুক্ত। মহাযুদ্ধের শেষে শান্তির জন্য যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় তারও শান্তিপ্রক্রিয়া হাস্যকর— যেন ‘মেদিনী মুখর এক নায়কের স্তরে।’

“আমি বিংশ শতাব্দীর

সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর

নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে

বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তরে

নিরুত্তব, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে

যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।”[১২৫]

—আস্থা হারানো একজন কবির শেষতম কাব্যগ্রন্থ “দশমী”তেও (১৯৫৬) দেখেছেন ‘পৃথিবী অনাথ; যথেচ্ছ পরমাণু—

“অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :

অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;

বিরুপে বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।”[১২৬]

বস্তুত আধুনিকালের ব্যক্তস্বাতন্ত্র্যবাদী স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ; একজন কবির পক্ষে সমসাময়িক সমাজ চিন্তা ও সমসাময়িক ঘটনাবলী; ইতিহাসবোধ শিল্পরূপ পেয়েছে নাস্তিকতার সুরের প্রশ্রয়ে। আধুনিক কবিতায় ‘সদাজাগ্রত মনন’-এর কবি বিষ্ণু দে সংশয়-ক্লান্তি-বিতৃষ্ণা-নৈরাশ্য-জিজ্ঞাসা-নির্বেদের আশ্রয়হীন অবস্থা থেকে পৌঁছেছেন সামাজিক সমবায়ের পথে; নিরন্তর প্রগতিশীলতায়।

ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করে ‘‘উর্বশী ও আর্টেমিস’’ (১৯৩৩)-এর কবি ‘‘চোরাবালি’’ (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতায় উচ্চারণ করলেন—

‘‘দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?’’[১২৭]

‘অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি’-এর পর অনেক মত— মতামত, বিপ্লব-আন্দোলন-যুদ্ধমৃত্যুর লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ক্ষয় আর ক্ষতির রুগ্ন-ফাঁপা চোরাবালি সভ্যতায় শুনলেন— ‘পদধ্বনি!/কার পদধ্বনি শোনা যায়?’ এই সময়েই কবির স্থানান্তর সম্ভাব্য হয়ে উঠল অর্থাৎ বিগত দিনের আত্মসুখময় সংগীত— ‘এ-সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে’। কবির কবিতায় উঠে এল ব্যক্তি-শ্রেণীর সংকট— যে আসলে সমগ্র সমাজেরই সংকট। সমাজ— শাসন ও শোষণে সেই সমাজের বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ-প্রগতি ব্যাহত। এবং তার ওপরে যদি দুর্নীতি-জাল-স্বজনপোষণ ইত্যাদি সব আত্মপ্রতারণা থাকে তবে যে ফল নৈরাজ্য হবে তা অনস্বীকার্য। এই সময় একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ মানবতার অপমান সর্বোচ্চমাত্রায় প্রকাশিত হয় এবং অন্যদিকে পরাধীনতা— ভারতীয় অর্থনীতিতে যে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থই মূল লক্ষ্য ছিল তা প্রকট আকার ধারণ করে ভোগবাদী বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের হাত ধরে। অতএব, সাম্যবাদের বিশ্বাসী কবির ‘পদধ্বনি; শুনতে পাওয়া সম্ভাব্য হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী ‘‘সাতভাই চম্পা’’ (১৯৪৫); ‘‘সন্দ্বীপের চর’’ (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থেও মানুষ ও সমাজের কথা— ফ্যাসিবাদ-ন্যাৎসীবাদের বর্বর উল্লাস-হত্যার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নিউ মেক্সিকো স্টেটের মরু অঞ্চলে পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটানো (১৯৪২) সহ ভারতবর্ষের কমিউনিস্টপার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা, দুর্ভিক্ষ— অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, কলকাতায় জাপানী বোমা নিক্ষেপ; সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ অধীন ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রাম শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু’টিকে ধ্বংস করে দেওয়া (১৯৪৫); অধরা শান্তিকে ধরার জন্য রাষ্ট্রসংঘ গঠিত এবং হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ শুরু (১৯৪৬) সহ ভারতবর্ষের তেভাগা ও তেলেঙ্গাননা আন্দোলন নৌ-বিদ্রোহের সূচনা; সাম্প্রতিক দাঙ্গা এবং দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু— মৃত্যু-মিছিলের ওপরে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট)। এই সবের মধ্যেই সাম্যবাদী কবির উচ্চারণ—

‘‘চাষীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য খেতে খামারে ইঁদুর,
সোনালী সূর্যাস্ত শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোটো নদীপথে গ্রামে বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, নেমে গেছে গানের নিখাদ।’’[১২৮]

এই পর্বের কবিতাসমূহে জনসমাজ-মাটির যে শিল্পরূপ অঙ্কিত হয়েছে—

"জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে।
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখিবাঁধা কিশোর হাতে
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।
...
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।।"[১২৯]

লোকজীবন-লোকায়ত রূপকথার কবিতা— 'সাঁওতাল কবিতা', 'ছত্তিশগড়ী গান', 'উরাওঁ গান', 'সাত ভাই চম্পা' ইত্যাদি। এইসব কবিতাতে যে ভাবের প্রকাশ তা সহৃদয় সামব্যবাদেরই উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আলোকিত।

একজন কবি সর্বতোভাবে স্বাধীন— তাঁকে কোন বাদ-প্রতিবাদ; দল-দলীয় মতের উপরিতলের ঠুন্‌কো টানাপোড়েন টানতে পারে না। তিনি শুধু জানেন তাঁর সৃষ্টি যেন লগ্নভ্রষ্ট না হয়— কারণ তাঁর খোঁজ যে শিকড়। "অন্বিষ্ট" (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থেও কবির খোঁজ সুস্থতার-স্বাধীনতার সমগ্রতার-স্পন্দনের—

"আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে-স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না
সহাস জীবনে এনে দিক্
সজহ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সকল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ..."[১৩০]

"অন্বিষ্ট"-এর পর "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" (১৯৫৩), "আলেখ্য" (১৯৫৮); "তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ" (১৯৬০);-এর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ" (১৯৬৩)— স্বাধীনতার একযুগ অবসানের পরেও অন্ধকার সরে যাওয়া দূরে থাকুক বরং অন্ধকার আরো গাঢ়তর হয়েছে। এই অসহায়বেলায়—

"এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,

যেখানে রয়েছি আজ যে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচবার আশা নেই, বাঁচাবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
যেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোই কোন আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
চৈতন্য মড়ক।"[১৩১]

'আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে'— তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই,— 'লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,'— তবে তাঁর "সেই অন্ধাকার চাই" (১৯৬৬), "সংবাদ মূলত কাব্য" (১৯৬৯), "ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে" (১৯৭০), "রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে" (১৯৭৩), "ঈশাবাস্য দিবা নিশা" (১৯৭৪), "চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর" (১৯৭৫), "উত্তরে থাকো মৌন" (১৯৭৭) এবং "আমার হৃদয়ে বাঁচো"(১৯৮১)— খোঁজ মূলত প্রেম-হৃদয়-মাটি এবং ভরসার।

শঙ্খ ঘোষ যথার্থ জীবনের প্রকাশক অর্থাৎ সমাজের ব্যক্তি-সমষ্টির দায় তিনি নিজের করে নিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালের এই কবির কাব্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনা— দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ, জীবনসংগ্রামের তীব্রতা সুচারু রূপ পেয়েছে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা-ভালোবাসা সমন্বয়ে। স্বাধীনতার অনতিকালেই তাঁর উচ্চারণ—

"তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি!"[১৩২]

অথবা—

"এ কোন্ দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িত মুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার

...

অসংখ্য-শিবিরে-রুদ্ধ শিবির কামনা করে

এ কোন্ দেশ?''[১৩৩]

—দেশভাগের গ্লানি, স্বাধীনতা অনতি দূরের জীবন-সংকট, খাদ্য সংকট এবং অন্যান্য সংকটসমূহকে নান্দনিক ও সামাজিক সত্যে মেধা ও হৃদয়ের পরম মেলবন্ধনে অঙ্কন করেন। ১৯৫১ সালের কুচবিহারের খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোরীর মৃত্যু বেদনায় যেমন সেদিন 'যমুনাবতী' রচিত হয়েছিল, তেমনি সাতের দশকে (১৯৬৭-১৯৭৫) নকশালবাড়ি আন্দোলনে একাধিক যুবক-যুবতীর 'ছিন্ন শির' তাঁর কলমে ব্যথাময় অনন্য মাত্রা পায়। আবার ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থা অথবা ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম ঘটনা; 'আত্মঘাত' অথবা প্রতিদিনের অপমান-আঘাত— বদলের পর পাল্টা-বদল 'প্রগল্‌ভতাহীন'ভাবে উচ্চারিত।

শঙ্খ ঘোষের বুকের মধ্যে যেন ক্ষতের পর ক্ষত— ক্ষতসকল চেতনে-অবচেতনে বিরোধহীনভাবে উঠে এসেছে আর তাতে ছড়ানো আছে গভীরতম ব্যথা— কোথাও স্পষ্ট, কোথাও-বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। তাঁর 'যমুনাবতী', 'বুড়িরা জটলা করে', 'বাস্তু', 'ভিড়' 'আরুণি উদ্দালক', 'জাবাল সত্যকাম', 'কলকাতা, 'হাসপাতাল' অথবা 'স-বিনয় নিবেদন', 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি', 'একটি মেয়ে, মাকে', 'মন্ত্রীমশাই'— বহু ক্ষতের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক রূপ। আলোচিত, তাঁর কবিতায় প্রেম, বিষাদ, নাগরিকতা— সমস্তটাই যেন সমাজের নানাতল থেকে উঠে আসা, যুদ্ধ-যুদ্ধে নানারকমের ভাগ-বিভাগে-অপমানে-আত্মসংকটে জর্জরিত উচ্চারণ।

> ''সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। সকালবেলায় একদিন কাগজ খুলে দেখি, প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে কুচবিহারের খবর : পুলিশের গুলিতে কিশোরীর মৃত্যু। তবে, বারো নয়, সে-কিশোরীরর ছিল ষোলো বছর বয়স।
>
> বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা। ক্ষোভেলজ্জায় কাগজ হাতে বসে থাকি এই খবরের সামনে। এক কিশোরী? চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, আজও এই খবর?...
>
> চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, দেশের মানুষের কাছে তার খবর এসে পৌঁছেছে, কিন্তু খাবার এসে পৌঁছয়নি তখনও। চালডালের আর্জি নিয়ে লোকে তাই কখনো-কখনো শহরে এসে দাঁড়ায়, খিদের একটা সুরাহা চায় তারা। তেমনি এক দাবির আন্দোলনে কুচবিহার কাঁপছে তখন। অনেক মানুষের মিছিল চলে এসেছে শহরের বুকে, হাকিমসাহেবের দরবারে।
>
> এসব সময়ে যেমন হয় তেমনই হলো। নিরাপত্তার জন্য তৈরি রইল পুলিশের

কর্ডন। নিষিদ্ধ সীমা পর্যন্ত এসে থমকে গেল মিছিল। ঘোষণা আছে যে কর্ডন ভাঙলেই চলবে গুলি, তাই তারা ভাঙতে চায় না নিষেধ। তারা কেবল জানাতে গিয়েছিল তাদের নিরুপায় দশা। তাই নিষেধের সামনে, সারাদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ আর জনতা।

তারপর ধৈর্য ভেঙে। কার ধৈর্য, তা আমরা জানি না। কিন্তু কাগজে খবর ছিল এই যে, মিছিলের একেবারে সামনে থেকে একটি ষোলো বছরের মেয়েকে কর্ডনের এপারে টেনে নেয় পুলিশ, আর 'অবৈধ' এই সীমালঙঘনের অভিযোগে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাকে, পথের ওপরই মৃত্যু হয় তার। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর কত অনায়াস সেই মৃত্যু!''[১৩৪]

—তাঁর কলমে কবিতারূপ 'যমুনাবতী' নামে। কবিতাটি একই সঙ্গে ঐতিহ্য-ইতিহাস-সমাজ-দেশ-কালের অনন্য অঙ্কন। অন্যদিকে 'স-বিনয় নিবেদন' কবিতার 'সূচনাকথা'-হিসেবে কবি বলেন—

''সেই চোদ্দই মার্চে ...। ঘটনাটার কিছুই জানতে পারিনি তখন। পনেরো তারিখের বিকেলবেলায় শিলিগুড়িতে অশ্রুর বাড়িতে পা দিয়েই চোখে পড়ল খবরের কাগজের বড়ো বড়ো শিরোলেখ। স্তব্ধ হয়ে গেলাম সবাই। কলকাতায় কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও হলো ফোনে। পরদিন গোটা রাজ্যে বনধ্। অস্থির লাগছে আমাদের। শেষ পর্যন্ত এই পরিণামে এসে পৌঁছল বামপন্থা? সকালবেলায় বসবার ঘরে অশ্রু কিছু কথা বলছে, কখনো কাগজ পড়ছে। অর্ধমনস্কতায় ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তুলে নিই পাশে-পড়ে থাকা একটা রসিদকাগজ। অশ্রু এটা-সেটা বলছে, হুঁ-হাঁ করতে করতে আমি তখন লিখে ফেলছি ওই লাইনকটা। অশ্রু একবার জিজ্ঞেস করেছিল কী করছ?' বলেছিলাম 'কিছু না'। ১৮ তারিখের পত্রিকায় লেখাটা ছাপা হয়ে যাবার পর অশ্রু জানতে চেয়েছিল 'কখন হলো বলো তো লেখাটা?' তথ্যটা জেনে বিস্মিতই হয়েছিল একটু। মানসিক অবস্থা? একটা লজ্জা গ্লানি আর কষ্টের বোধ থেকে ওই লেখা। সেসব যেমন ভোলা যায় না, তেমনি ভোলা যায় না সেই কষ্টটাও যে এমন-একটা লেখাও লিখতে হলো।''[১৩৫]

সেদিন অর্থাৎ ১৯৫১-তে যেমন লিখতে হয়েছিল 'যমুনাবতী', এদিন অর্থাৎ ২০০৭-এ তাঁকেই লিখতে হয় 'স-বিনয় নিবেদন'! আবার তারও পরবর্তীতে ২০১১-তে অর্থাৎ আরও একবার— ডান থেকে বাম-বাম থেকে ভিন্ন-ডানের শাসনকালে এসে লিখতে হয়—

''এখনও কি তুমি প্রতিবাদ করো?
—মাওবাদী!

প্রশ্ন করার সাহস করেছ?
—মাওবাদী
চোখে চোখ রেখে কথা বলো যদি
ঘড়ি-ঘড়ি সাজো মানবদরদি
আদরের ঠাঁই দেবে এ গারদই
মাওবাদী—
সহজ চলার ছন্দটা আজ
একটু না-হয় দাও বাদই!

দুই চোখে দেখি সর্ষেফুলের মতো থোকা থোকা
মাওবাদী
এখানে-ওখানে দোকানে-বাজারে-হাজারে হাজারে
মাওবাদী
বাঁকা হাসি দেখে ঠিকই চিনে যাই
মাওবাদী, তুমি মাওবাদী!''[১৩৬]

না, এইসব কবিতা কেবলমাত্র 'নির্দিষ্ট' সময়ের সময়চিহ্ন নয়, কবির সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সচেতনতার 'জীবনজগৎজড়ানো' সংকটকথার মথিতরূপ। তাঁর আত্মার স্বর।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর ''তুমি তো তেমন গৌরী নও'' (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত যে 'পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী' -এর 'কর্কশ' ছবি এঁকেছিলেন ''আদিম লতাগুল্মময়''-এ (১৯৭২) সেই কর্কশতার চিত্র আরও বেশি প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশিত। কবির এই সময়ের উচ্চারণে প্রতিবাদ আরও বেশি তাৎপর্যময় স্পষ্ট। তাঁর 'দল', 'ইঁদুর', 'রাজনীতি', 'ক্রমাগত', 'যাদব', 'আদর', 'যুক্তি', 'শ্লোগান', 'মহিষ', 'নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি', 'শীতে একটি নিগ্রো মেয়ে', 'সত্যি বলার মানে', 'কলকাতা', 'বোকা', 'বিবেক', 'চিতা' কবিতা উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

''এমনিভাবে থাকতে গেলে শেষ নেই শঙ্কার
মারের জবাব মার

বুকের ভিতর অন্ধকারে চম্‌কে ওঠে হাড়
মারের জবাব মার

বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মা-র

মারের জবাব মার

কিন্তু তারও ভিতরে দাও ছন্দের ঝংকার
মারের জবাবে মার

কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছল্‌কে ওঠে শব্দের সংসার।''[১৩৭]

যে সমকালসচেতনা ও প্রতিবাদীধারার উচ্চারণ প্রাধান্য পেয়েছে চল্লিশের দশকে— অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায়। মানুষের জন্য সহমর্মিতা এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিমূখতা এই সময়ের কবিতার অন্যতম লক্ষণ। অরুণ মিত্র—

''প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো!
...
উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেবতার ক্রোধে কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষেরা, হুঁশিয়ার!
লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার।''[১৩৮]

অরুণ মিত্রের 'কসাকের ডাক : ১৯৪২', 'সাময়িক', 'মুখর', 'আমরা দখল নিলাম', 'সীমান্ত', 'ভ্রুকুটি', 'আর এক আরম্ভের জন্য'— কবিতায় সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামকথা সহজভাবে উন্মোচিত হয়েছে। সমানভাবে বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কলমে সমাজ জিজ্ঞাসার কথা লিখিত। এই সময়েই দিনেশ দাস লিখলেন—

''বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
শেল আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!''[১৩৯]

—এই কাস্তে এবং সাধারণ মানুষের ভাতের কথা অথবা সাম্য-প্রগতির কথা কবি শেষ দিন পর্যন্ত

লিখে গেছেন।

সমাজমনষ্ক ও প্রতিবাদী কবিতার ধারার অন্যতম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়— সরল অথচ দৃঢ়। সাম্যের জন্য যুদ্ধ-ঘোষণা করেও পিছপা নন তিনি। সমাজ-দেশ-কাল জড়িত হয়েও তাঁর কবিতা আন্তর্জাতিক— পৃথিবীর সব-হারানো মানুষের কবিতা। তাঁর 'মে-দিনের কবিতা', 'সকলের গান', 'প্রস্তাব', ১৯৪০ : 'অতঃপর', 'জনযুদ্ধের গান', 'ঘোষণা', 'মিছিলের মুখ', 'সালেমনের মা', 'কাল মধুমাস'— কবিতায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংঘাত-সম্পর্ক তুলে ধরেছে সাম্যবাদী ভাবনায়।

> ''শতকোটি প্রণামান্তে
> হুজুরে নিবেদন এই—
> মাপ করবেন খাজনা এ সন
> ছিটেফোঁটাও ধান নেই।
> ...
>
> পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
> হুজুর জেনে রাখুন
> খাজনা এবার মাপ না হলে
> জ্বলে উঠবে আগুন।।''[১৪০]

অথবা—

> ''শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
> প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
> মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
> পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।''[১৪১]

তবে এই সমাজমনস্ক সঙ্গে আত্মোপলব্ধি কবিতাও লেখা হয়েছে চল্লিশের দশকে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্মরণ অনিবার্য যে, সত্যিই কি কবিতা কেবলমাত্র সাম্যবাদের বা বিপ্লবের বা প্রেমের হয়? সমস্ত কবিতাতেই কি বহুতল থাকে না? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতাচর্চার সূচনাবিন্দু থেকেই 'গ্রহচ্যুত'। তাঁর কবিতায় 'বিষাক্ত ধিক্কারের সঙ্গে রয়ে গেছে এক প্রগাঢ় কোমলতা'। 'আপাতশিল্পহীনতা'— উচ্চারণের পাশে মানবতা ও কাব্যময়তা বর্তমান।

> ''শহরে এখন সন্ধ্যা নেমেছে, তৃষিতের কথকতা...
> ফ্যান দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
> ঘরে ভাত নেই, মাগো, তুই কাছে আয়—

আমি পড়ি বসে কুপির আলোয় জীবনের রূপকথা।

...

রূপকথা নয়, ইতিহাস মাগো, ক্ষুধিতের অভিযান।"[১৪২]

অথবা—

"আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির-আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত।"[১৪৩]

—পীড়ন ও পীড়িতের এক আশ্চর্য ছবি— 'আর আমরা সারারাত জেগে থাকি/আশ্চর্য ভাতের গন্ধে'! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমান-সমান মানুষের কবিতা, সর্বহারা মানুষের কবিতা। তিনি একই সঙ্গে প্রগতিবাদী ও প্রেমী— প্রেমী না হলে কী প্রগতিবাদী হওয়া সম্ভব! তাঁর কবিতার পাঁজরে-পাঁজরে মানুষ-মাটি-দেশ-কাল ও বেঁচে থাকার গভীর আকুতি ও অনন্য ঘ্রাণ বর্তমান। এই আবহের অন্যতম নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর কবিতাতেও সমাজ- দেশের কথা নিবিড়ভাবে উচ্চারিত।

চল্লিশের দশকের প্রগাঢ় সমাজমনস্কতা ও প্রতিবাদী চেতনা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় করুণায় গাঢ় হয়ে প্রকাশিত— নম্র, আন্তরিক, আত্মসমালোচিত। শঙ্খ ঘোষ প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই গূঢ় ও গাঢ়ভাবে সমাজসচেতন— ব্যক্তিগত উচ্চারণের ভেতরেও রয়েছে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় ছায়া। তিরিশের কবিদের ব্যক্তি-সমাজসচেতনতা বা চল্লিশের কবিদের সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা তাঁর কবিতায় সমগ্র সত্তা মথিত করে উঠে এসেছে। অন্ধকার সময়ে তিনি যেন একা লণ্ঠনধারী, শূন্যতার ভেতরে জীবনের ঢেউ, জানু পেতে বসে প্রার্থনারত পূজারী—

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"[১৪৪]

জরুরী অবস্থা কিংবা যখন 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' শোনেন অথবা আরও পরবর্তীতে যখন কেবল 'নীরব' চিৎকারের সময়— প্রায় সমস্ত অবস্থাতেই কবি সচেতন— 'হেতালের লাঠি নিয়ে' পাহারারত 'কানীর' চক্রান্তাঞ্চলে। ব্যক্তি-সমাজ-ইতিহাসকে তিনি ধরেন সমগ্রের বোধ দিয়ে—

‘অন্ধবিলাপ’ কবিতায় যেমন ‘উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক’ উচ্চারিত হয় তেমনই ‘দুর্যোধন’ কবিতায়—

“নারায়ণ নয় আমি পেয়ে গেছি নারায়ণী সেনা
যতদূর যেতে বলি যায় এরা, কখনো আসে না
কোনো কূটতর্ক নিয়ে। ভাবলেশহীন
ধ্বংস হাতে ছুটে যায়। যদি বলি দিন, এরা বলে দেয় দিন
যদি বলি রাত, বলে রাত।
বরাত, বরাত
বড়োই বরাতজোরে মুঠোর ভিতরে কাঁপে হাঁস
হিমাচল শিলা থেকে সাগর অবধি আমি ছুঁড়ে দিই ত্রাস
আমার কী এসে যায় বাঁচে কি বাঁচে না ইতিহাস
সমস্ত মাঠের বিন্দু আমারই ধর্মের ধান বোনা
সূচ্যগ্র মাটিও আমি অন্য কোনো শরিকে দেব না
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
আমিই গম্বুজ চূড়া আমি দেশ আমিই সমাজ।”[১৪৫]

শব্দ দিয়ে নয়, শব্দের ভেতরের নীরবতা দিয়ে তিনি সমস্ত ক্ষত-মুখের পলিকথা তুলে আনেন, সমস্ত জউঘর অপঞ্জ। তিনি লেখেন ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’, ছন্দের ভিতরকার অন্ধকারসমূহ আবার ‘হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ’ রাশি। তিনি কথা বলেন— ‘আমি এই শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলি’, শালপ্রাংশু, মধ্যরাত্রি— দল ও দলবৃত্তে অন্ধ, ভূমিহারা, সন্তানহারা আর যারা চুপ ছিল যারা কিছু দেখেও দেখেনি’— তাঁর অনেক ‘আমি’ সেইসব কথাই লেখেন—একক, অনন্য এবং স্বতন্ত্র্যভাবে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তিরিশের দশকের মেধাবী কবিদের মতো ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল— আঙ্গিকগত দিক থেকে নয়, চেতনাগত দিক দিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখের সামাজিক-আর্থিক চেতনাগত প্রকাশ শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে লক্ষ্য করা যায়— যোগ করেন আত্মসমালোচনা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভেতরে যে শূন্যতা বিরাজমান সেই শূন্যতার কথা শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও বিস্তারিত— কিন্তু ইতি নয় সেই-স্থানে বরং যোগ হয়েছে সমালোচনা এবং আলো-সন্ধান, ব্যক্তির শূন্যতা ভাবনা জায়গা নিয়েছে সামাজিক শূন্যতাবোধে। সমর সেনের কবিতায় যে নাগরিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায় বা আঁকা আছে, শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও নগর জীবনের চিত্র আঁকা আছে— তবে এই ছবিতে নিজশ্রেণী এবং নিজের মুখ-মুখোশ বর্তমান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সমাজ-রাজনীতি সচেতনতা অর্থাৎ সামাজিক ঢেউ সচেতনতার স্পষ্ট রেখা দেখা যায় শঙ্খ ঘোষের

কবিতাতেও। মূলত এই কবি প্রতিভা ও মনীষা, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার মেলবন্ধনে সমাজ দেশকালের প্রেক্ষাপটে অন্তর্লোকের গহন তলের 'তৃতীয় সত্তা'র কবিতার কারিগর— তাতে জল-জীবন, মাটি-রহস্য, বেঁচে থাকা-অর্থ-সামাজিকতা-রাজনীতি সবই বর্তমান।

"স্বরান্বিত হব ভেবে এসেছি তোমারই কাছে আজ—
এসে দেখি তুমি সেই একইমতো অস্ফুট বয়ান।
ভিড়ে ভরে আছে বৃত্ত, এ-বৃত্তে কোথাও নেই সাড়া
বহুস্বর স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে এইখানে এসে।

তা বলে ভাবো কি আমি সরে যাব ভিন্ন কোনো দেশে?
ভাবো এ ঘটনামালা তুচ্ছ ভেবে ছেড়ে দেব ঘর?
ত্রিকাল বলয় করে ঘিরে রাখে প্রতি পদপাত
তারই থেকে জেগে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ছবি, ভিন্ন স্বর।

কী হবে তা দেখতে পাইনা, কিন্তু তবু দৃষ্টি থামাবে কে?
প্রতিটি মুহূর্ত দেখি অতিদূর ভবিষ্যৎ থেকে।"[১৪৬]

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বুদ্ধদেব (সম্পা.) : আধুনিক বাংলা কবিতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কল-৭৩, প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৭।

২. জীবনানন্দ, দাশ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কল-২৩, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬২, দশম সংস্কার মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১০।

৩. আইয়ুব, আবু সয়ীদ; মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (সম্পা.) : আধুনিক বাংলা কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪।

৪. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩২।

৫. Eliot, T.S	:	Selected Essays, Faber and Faber, First Published 1932, Third Paper Book Edition First Published 1999, P. 14.
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ	:	রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী সংস্করণ, পৌষ ১৪১৭, পৃ. ৬৯৮।
৭. বসু, মেঘ (সম্পা.)	:	হে প্রেম, পারুল প্রকাশনী, কল-০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, পৃ. ৫।
৮. বসু, বুদ্ধদেব	:	শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি১৯৫৩, চতুর্দশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০।
৯. তদেব	:	পৃ. ১৮।
১০. তদেব	:	পৃ. ২২।
১১. দাশ, জীবনানন্দ	:	শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৪, দ্বাদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৪৪।
১২. তদেব	:	পৃ. ৭৪।
১৩. তদেব	:	পৃ. ১০৮।
১৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি	:	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৫, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ১২৪।
১৫. দাশ, জীবনানন্দ	:	শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৪, দ্বাদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১২৬।
১৬. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ	:	শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫।
১৭. তদেব	:	পৃ. ৩৩।
১৮. ত্রিপাঠী, দীপ্তি	:	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৫, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ২৫৩।

১৯. তদেব : পৃ. ৩০৬।

২০. দত্ত, অজিত : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ৫৩।

২১. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ ২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৩৪৬।

২২. তদেব : পৃ. ৩৪৭।

২৩. তদেব : পৃ. ৩৪৭।

২৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২৩।

২৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৩৩, ৩৪।

২৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ২৯৩।

২৭. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ ২, ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৩৭৭।

২৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৫০।

২৯. তদেব : পৃ. ৫২।

৩০. তদেব : পৃ. ৩৩।

৩১. তদেব : পৃ. ৯৩।

৩২. তদেব : পৃ. ১৫৮।

৩৩. সিংহরায়, জীবেন্দ্র : আধুনিক কবিতার মানচিত্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৬, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ.

৩৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৫০

৩৫. তদেব : পৃ. ৯৭।

৩৬. তদেব : পৃ. ১৪২, ১৪৩।

৩৭. ঘোষ, শঙ্খ : হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ, সিগনেট প্রেস, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৫৫।

৩৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২১৬

৩৯. তদেব : পৃ. ১৭৪, ১৭৫।

৪০. তদেব : পৃ. ৫৭।

৪১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৯৯।

৪২. তদেব : পৃ. ২৭।

৪৩. দাশ, শ্যামলকান্তি (সম্পা.) : কবিসম্মেলন, পত্রলেখা, কল-০৯, অষ্টম বর্ষ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ২০।

৪৪. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৭।

৪৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৮৯

৪৬. ঘোষ, বিশ্বজিৎ; রহমান, মিজান (সম্পা.) : জীবনানন্দ দাশ : জীবন ও সাহিত্য, কথাপ্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২২৮।

৪৭. তদেব : পৃ. ২২৯।

৪৮. দাশ, জীবনানন্দ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৪, দ্বাদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১২।

৪৯. তদেব : পৃ. ১৫।

৫০. তদেব : পৃ. ১৭, ১৮।

৫১. তদেব : পৃ. ১৯।

৫২. দাশ, জীবনানন্দ : কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, ২৫/৪, কবি মহঃ ইকবাল রোড, কল-২৩, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬২, দশম সংস্করণ ১৪১৩, পৃ. ১২।

৫৩. দাশ, জীবনানন্দ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৪, দ্বাদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১৯।

৫৪. তদেব : পৃ. ৩০।

৫৫. তদেব : পৃ. ২৯।

৫৬. তদেব : পৃ. ৪১।

৫৭. তদেব : পৃ. ৪৭।

৫৮. তদেব : পৃ. ৫০।

৫৯. তদেব : পৃ. ৫০, ৫১।

৬০. তদেব : পৃ. ৮১।

৬১. তদেব : পৃ. ১০৪।

৬২. তদেব : পৃ. ১২৪, ১২৫।

৬৩. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮২।

৬৪. বসু, বুদ্ধদেব : কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, ৮/১, চিন্তামনি দাস লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, নিউ এজ চতুর্থ সংস্করকণ মে ২০১০, পৃ. ৭১, ৭৩।

৬৫. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০০, ১০১।

৬৬. তদেব : পৃ. ১০০।

৬৭. তদেব : পৃ. ১২৭, ১২৮।

৬৮. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬০, ৬১, ৬২।

৬৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৮।

৭০. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৫।

৭১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ২০।

৭২. তদেব : পৃ. ১৭২, ১৭৩।

৭৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৫২।

৭৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৩২, ৩৩

৭৫. তদেব : পৃ. ১২২, ১২৩

৭৬. তদেব : পৃ. ২১৫।

৭৭. ৭৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ১৩৭।

৭৮. তদেব : পৃ. ১৮৩

৭৯. তদেব : পৃ. ২৯৫, ২৯৬।

৮০. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা.) : বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, রহড়া, কল-১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৭, ৪৮।

৮১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৫৩।

৮২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৬৪।

৮৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ১৮৫।

৮৪. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিশঃব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৫৩।

৮৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১১৫, ১১৬।

৮৬. সেন, সমর : বাবু বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯১, পৃ. ১০২।

৮৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৬৯, ১৬০।

৮৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৫৩।

৮৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৯৮।

৯০. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৩, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪, পৃ. ৪৫।

৯১. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অরুণা প্রকাশণী, কল-০৬, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮১, নবম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১৪।

৯২. দাশ, জীবনানন্দ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১, দ্বাদশ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৮১, ৮২।

৯৩. তদেব : পৃ. ১১৭।

৯৪. দে, বিষ্ণু : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ ১৩৬২, অষ্টম দে'জ সংস্করণ

আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. ২৩।

৯৫. তদেব : পৃ. ১৪৭।

৯৬. সেন, সমর : সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম আনন্দ সিগনেট সংস্করণ জুলাই ২০১২, পৃ. ৩৪।

৯৭. তদেব : পৃ. ৩৭।

৯৮. তদেব : পৃ. ৪৩, ৪৪।

৯৯. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৭, ২৮।

১০০. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.) : বুদ্ধিজীবীর নোট বই, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৫, পৃ. ১৩৭।

১০১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৯৯৩, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪, পৃ. ২৫।

১০২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৭১।

১০৩. তদেব : পৃ. ৭১।

১০৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৩, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪, পৃ. ২৩।

১০৫. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৯৭।

১০৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৪৭।

১০৭. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৭৭।

১০৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৭৮।

১০৯. তদেব : পৃ. ১৯০।

১১০. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, পৃ. ১৮।

১১১. তদেব : পৃ. ৫৩।

১১২. ঘোষ, রতনতনু (সম্পা.) : বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, কথাপ্রকাশ, শাহবাগ ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০০৯, পৃ. ৭।

১১৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, পৃ. ৮৮

১১৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩০৪।

১১৫. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা.): বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, রহড়া, কল-১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৯।

১১৬. দাশ, জীবনানন্দ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১, দ্বাদশ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৮।

১১৭. তদেব : পৃ. ২০।

১১৮. তদেব : পৃ. ৪৭।

১১৯. তদেব : পৃ. ২৩।

১২০. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০০।

১২১. তদেব : পৃ. ১০০।

১২২. তদেব : পৃ. ১০১।

১২৩. তদেব : পৃ. ১০৮, ১০৯।

১২৪. তদেব : পৃ. ১১৮, ১১৯।

১২৫. তদেব : পৃ. ১২৮।

১২৬. তদেব : পৃ. ১৩৮, ১৩৯।

১২৭. দে, বিষ্ণু : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, অষ্টম দে'জ সংস্করণ আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. ২২।

১২৮. তদেব : পৃ. ৬৩।

১২৯. তদেব : পৃ. ৭৬, ৭৭।

১৩০. তদেব : পৃ. ৯০।

১৩১. তদেব : পৃ. ১৪৯।

১৩২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৪৪

১৩৩. তদেব : পৃ. ৩৪, ৩৫।

১৩৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৩, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪, পৃ. ১৭।

১৩৫. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭৫, ৭৬।

১৩৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩০৮

১৩৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৪৪

১৩৮. মিত্র, অরুণ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪০৬, তৃতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৪, ৫।

১৩৯. দাস, দিনেশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, সপ্তম দে'জ

সংস্করণ, জুন ২০১১, পৃ. ২৭।

১৪০. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৭, দ্বাদশ দে’জ সংস্করণ মাঘ ১৪১৪, পৃ. ৩০, ৩১।

১৪১. তদেব : পৃ. ১৫।

১৪২. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে’জ সংস্করণ মাঘ ১৪০০, পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৩০।

১৪৩. তদেব : পৃ. ৫৭।

১৪৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ২১৪।

১৪৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, পৃ. ১৪২, ১৪৩।

১৪৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৬৩।